KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫ সাদার্ন মার্কেট [illegible], কল-২৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 7/3 7/4 8/1 8/2	Year of Publication : Aug 1984 July - Sep 1984 Feb 1985 April 1985.
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

সম্পাদক ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

২৭

Medium & Large Scale Entrepreneurs :
Do you have any intention to set up industries at

SILIGURI & ULUBERIA !

We are waiting for you with land with basic industrial infrastructure facilities. It is our another endeavour after establishing industrial growth centres at Haldia, Kharagpur & Kalyani.

Please, call on us conveniently.

West Bengal
Industrial Infrastructure
Development Corporation
P-34, C. I. T. Road (2, 3, & 4 Floors)
Calcutta-700 014

Phone No. : 24-8684, 8525, 8096

সূচীপত্র

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
শীত ১৩৯১
বিভাব

প্র ব ন্ধ

বিস্মৃত সাংবাদিক গুরু অমৃতলাল রায় ॥ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ১৭
ফরাসী বিপ্লব ও বাঙালী সমাজ ॥ সুরেশচন্দ্র মৈত্র ৭৬

আ লো চ না

ব্যাকরণসূত্রের পরিধি ॥ শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ ৯৫
সত্যজিৎ রায়ের গল্প ॥ পিনাকী ভাদুড়ী ৫৮

গ ল্প

বিষয় : বাদশাবাঁদী ॥ সুনীল দাশ ৬৫
উত্তরাধিকার ॥ আদিনাথ ভট্টাচার্য ১০৯

ক বি তা গু চ্ছ

শামসুর রাহমানের কবিতা ॥ বাহারুদ্দিন ৩২
শামসুর রাহমানের চারটি কবিতা ৪৭
শঙ্খ ঘোষের কবিতা ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ৯৭
শঙ্খ ঘোষের তিনটি কবিতা ৯৯

সা ম য়ি ক প্র স ঙ্গ

পুলিনবিহারী সেন ॥ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ৫৪
সাহিত্য অকাদেমির আলোচনাচক্র ॥ অরুণ দে ১০১

ব্য ক্তি গ ত র চনা

মেধার বাতানুকুল ঘুড়ুর ॥ মলয় রায়চৌধুরী ১০৪

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার

দেবীপ্রসাদ মজুমদার প্রদীপ দাশগুপ্ত

শুভকুমার বসু

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলকাতা-১৭

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

অলংকরণ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস কলকাতা-১৭ থেকে
প্রকাশিত এবং সত্যনারায়ণ প্রেস, ১, রমাপ্রসাদ রায় লেন,
করুণা প্রিন্টার্স, ১৩৮ বিধান সরণী,
কলকাতা থেকে মুদ্রিত।

প্রবন্ধ

বিস্মৃত সাংবাদিক গুরু অমৃতলাল রায়

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

গত শতাব্দীর শেষ দিকে কলকাতা শহর থেকে 'হোপ' নামে একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হতো। এই কাগজটির প্রবর্তক ও সম্পাদক ছিলেন অমৃতলাল রায়। এই সময়ে কলকাতা থেকে 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'বেঙ্গলী', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'ইণ্ডিয়ান নেশন' প্রভৃতি যে সব নাম করা ইংরাজী সংবাদপত্র ছিল—প্রচারে ও প্রভাবে হোপ তাদের তুলনায় হীন ছিল না।

হোপ সম্পাদক অমৃতলাল রায়ের জন্ম হয়েছিল ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে অবিভক্ত বাঙলায় চব্বিশ পরগণা জেলার গরিফা বা গৌরীভা গ্রামে। রামকমল সেন, ব্রহ্মানন্দ, কেশবচন্দ্র সেন, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক রেভাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা পুরুষ এই গ্রামেরই সন্তান। অমৃতলালের পিতা মধুসূদন রায় ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলের অফিসে কাজ করতেন। ইনি সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। অমৃতলাল ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে হাওড়া স্কুলের ছাত্ররূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে এখান থেকে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ডাক্তারী পড়ার জন্য কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। এই সময় গুপ্তিপাড়ার উমাচরণ গুপ্তের কন্যা হেমন্তকুমারীর সঙ্গে অমৃতলালের বিয়ে হয়। অমৃতলাল বিলেতে গিয়ে ডাক্তারি পড়তে ইচ্ছুক হওয়াতে তার পিতা ও শ্বশুর উভয়েই তাঁকে অর্থসাহায্য করতে সম্মত হন ও এ বিষয়ে উৎসাহিত করেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময় অমৃতলাল

ইংল্যাণ্ডে যান এবং এডিনবরা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। এই সময়ে ভারতে জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল এবং সুদূর ইংল্যাণ্ডের প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র সমাজেও এর প্রভাব পড়েছিল। এই সময় ভারতে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার সমালোচনামূলক অমৃতলালের কিছু রচনা ইংল্যাণ্ডের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়াতে অমৃতলাল স্থানীয় সরকারের রোষ ভাজন হন। এ ছাড়া তিনি এদেশে শ্রমিক আন্দোলনেও জড়িত ছিলেন। অমৃতলাল বিলেতে পড়াশুনায় অমনোযোগী এই সংবাদ দেশেও পৌছে যায় এবং তাঁর অভিভাবকদের সঙ্গেও তাঁর এই নিয়ে মনান্তর হয়। দেশ থেকে অর্থ প্রেরণও বন্ধ হয়। একদিকে অর্থাভাব অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের রোষদৃষ্টি এই দুই পরিস্থিতি এড়াতে ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিকে অমৃতলাল ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়ে আমেরিকার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। এই সময় অমৃতলালের হাতে টাকা পয়সা ছিল না, চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থী এই পরিচয়ে একটি ডাচ জাহাজে বিনা ভাড়ায় তিনি স্থান সংগ্রহ করেন, শর্ত ছিল এই যে জলপথে যাত্রাকালে জাহাজের সার্জেনকে তিনি কাজে সাহায্য করবেন। অমৃতলাল সম্পূর্ণ কপর্দক শূন্য অবস্থায় নিউইয়র্ক শহরে পৌছে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রথমে একটি ইস্পাত কারখানায় কুলির কাজ জোগাড় করেন। এই ভাবে কিছুকাল চলার পর অমৃতলালের সঙ্গে ডাঃ লুইস নামে একজন ডাক্তারের আলাপ হয়ে যায়। ডাঃ লুইস অমৃতলালের ইংরাজী ভাষার উপর অধিকার দেখে খুব খুশি হন। চিকিৎসা শাস্ত্রে অমৃতলালের জ্ঞানও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। ডাঃ লুইস কুলির চাকুরি ছাড়িয়ে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে তাঁকে তাঁর পরিকল্পিত একটি চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত করেন। ডাঃ লুইস নিজের বাড়িতে অমৃতলালের থাকা ও আহারের ব্যবস্থা করে দেন, তাছাড়া তিনি অমৃতলালের কিছু হাত খরচেরও ব্যবস্থা করেন। লুইস দম্পতি অমৃতলালকে পুত্রের মতো স্নেহের চক্ষে দেখতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় 'Dr. Lewis Monthly' কাগজটি ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, এক বছর পর কাগজটি বন্ধ হয়ে যায়। অমৃতলালও পুনরায় বেকার হয়ে পড়েন। ডাঃ লুইস বড়লোক ছিলেন না, তাঁর পোষ্য হিসেবে থাকাও অতঃপর অমৃতলাল উচিত মনে করেননি। জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি বিভিন্ন কাগজে প্রবন্ধ লিখে কিছু অর্থ উপার্জনে মন দেন। এই কাগজগুলির মধ্যে 'Sun' ও 'North American Review' কাগজের নাম উল্লেখযোগ্য। সংবাদপত্রের অনিয়মিত প্রবন্ধ লেখক

হিসেবে যথেষ্ট আয় না হওয়াতে সময় সময় অমৃতলাল তাঁর পরিচিত সংবাদপত্রগুলির প্রেসে কম্পোজিটররূপেও কাজ করে নিজের খরচ চালিয়ে নিতেন। কোনো কায়িক পরিশ্রমেই তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। North American Review কাগজে অমৃতলাল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের তীব্র সমালোচনা করে একটি প্রবন্ধ লেখেন, সেটি বহু বিদেশী ভারত বন্ধুর মনোযোগ ও প্রশংসা অর্জন করেছিল। ভারতে ব্রিটিশ সরকারের কাছে এই প্রবন্ধটি বিশেষ বিরক্তিকর বিবেচিত হয়েছিল। অমৃতলালের লিখিত 'ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া' নামীয় এই প্রবন্ধটি 'নর্থ আমেরিকান রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর এলাহাবাদের ইংরাজ পরিচালিত 'পায়োনীয়র' সংবাদপত্রটি তাঁকে জনৈক লাল অমৃত (Red Amrita) আখ্যা দিয়েছিল। এতদিন বিদেশে অমৃতলালের কোন সন্ধান তাঁর আত্মীয় স্বজনের জানা ছিল না; এখন তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আত্মীয় স্বজন বিশেষত তাঁর পিতা তাঁকে ফিরে পাবার জন্য ব্যাকুল হন। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক রেভারেণ্ড ডঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের (১৮৪০-১৯০৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণকালে আকস্মিকভাবে তাঁর সঙ্গে অমৃতলালের সাক্ষাৎ হয়ে যায়। প্রতাপচন্দ্র অমৃতলালের স্বগ্রামবাসী ও আত্মীয় ছিলেন। প্রতাপচন্দ্র অমৃতলালকে দেশে ফেরার জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু অমৃতলাল তখনি এই প্রস্তাবে রাজী হননি। দেশে ফিরে প্রতাপচন্দ্র তাঁর পরম বন্ধু ও গুরুতুল্য কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) এবং অমৃতলালের পিতাকে তাঁর ঠিকানা জানিয়ে দেন। কেশবচন্দ্র অমৃতলালকে অবিলম্বে দেশে ফেরার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লেখেন, এই বৎসরই কেশব পরলোকগমন করেন। অমৃতলালের পিতা এই সময় বিহারের জামালপুর শহরে কর্মরত ছিলেন। নিজের ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা জানিয়ে তিনি অমৃতলালকে দেশে ফেরার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকেই অমৃতলাল স্বদেশে ফেরার জন্য মনে মনে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। পিতার চিঠি পেয়ে অমৃতলালের মনে আত্মীয় স্বজন সম্বন্ধে যে অভিমান এতকাল জমে ছিল তা দূর হয়ে যায়। অবশেষে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে অমৃতলাল দেশে ফিরে আসেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় অমৃতলালের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অল্পদিন পরই তার পিতা মধুসূদন রায় পরলোক গমন করেন। দেশে ফিরে অমৃতলাল প্রথমে চন্দননগর থেকে প্রকাশিত 'বিভা' নামে একটি বাংলা সাময়িক পত্রের সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দেন। এই পত্রিকার সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৪-

১৯১৪) বিভায় কিছুদিন কাজ করার পর অমৃতলাল অমৃতবাজার পত্রিকার সহকারী সম্পাদকপদে কাজ করেন। অন্যের কাগজে চাকুরি করে অমৃতলাল সুখী বোধ করেননি। ইউরোপ আমেরিকায় লব্ধ অভিজ্ঞতাকে স্বদেশের কল্যাণে নিয়োজিত করার গভীর আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল। নিজে একটি কাগজ বের করে তিনি দেশের জাতীয় জাগরণ ও উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। কাগজ চালাতে হলে একটি ছাপাখানার প্রয়োজন। আবার ছাপাখানা ক্রয়ের জন্য অর্থেরও প্রয়োজন। অমৃতলালের এক ভাই চুনীলাল রায় (ইনি উচ্চপদে চাকুরি করে 'রায় বাহাদুর' উপাধি পান)। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আগ্রহ দেখে চুনীলাল ও অন্যান্য ভ্রাতারা তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে একটি প্রেস কিনতে সম্মতি দেন। এর মধ্যে তাদের মায়ের অলঙ্কারও ছিল। পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে যে প্রেস কেনা হয় অমৃতলাল সেখান থেকেই ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে হোপ নামে একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র নিজের সম্পাদনায় প্রকাশ শুরু করেন। এই পত্রিকার প্রকাশের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে সামাজিক, বৈষয়িক ও রাজনৈতিক উন্নতি সাধন (social, industrial and political reform through self-helf) এ ছাড়াও এতে নাট্যাভিনয়, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনাও স্থান পেত। তরুণ ও অজ্ঞাতনামা লেখকদের লেখা ছেপে তাদের উৎসাহ দান করতেও অমৃতলালের উৎসাহ ছিল। প্রথমে রবিবার প্রকাশিত এই পত্রিকার কার্যালয় ছিল মধ্য কলকাতার ৬৫, অখিল মিস্ত্রি লেন। কিছুদিন পর কার্যালয়টি ৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটে উঠে আসে। সর্বশেষে এই কার্যালয় ছিল ২১, জেলিয়াটোলা স্ট্রীটে। পত্রিকাটির বার্ষিক মূল্য ছিল ৪·০ টাকা মাত্র। হোপ পত্রিকাটি প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দুপ্যাট্রিয়ট, বেঙ্গলী, ইণ্ডিয়ান নেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির আস্তিত্ব সত্ত্বেও হোপের প্রচার সংখ্যা ১২,০০০ অতিক্রম করে গিয়েছিল, তখনকার দিনে একটি পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ১০,০০০ হলেই তা যথেষ্ট বিবেচিত হতো। অমৃতলাল নিজে এই কাগজের সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখতেন। সম্পাদনার কাজে তাঁর সহকারী ছিলেন ভবিষ্যৎ যুগের বিখ্যাত বাগ্মী ও দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) স্বদেশী যুগের ও তার পরবর্তী কালের বিখ্যাত সাংবাদিক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর (১৮৬৯-১৯৩২) সাংবাদিক জীবন হোপ সংবাদপত্রে শিক্ষানবিস রূপেই শুরু হয়। এই কাগজের অন্যান্য সহকারীদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায় (১৮৫৭-১৯১৪) প্রবোধ প্রকাশ সেনগুপ্ত প্রভৃতি। সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরবর্তী কালে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরূপে প্রেমানন্দ ভারতী নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের পর ইনি ইউরোপ আমেরিকায় প্রেমধর্ম প্রচার করতে যান। স্বদেশে ও আমেরিকায় তিনি ইংরাজী ভাষায় কয়েকটি সাময়িক পত্র প্রবর্তন ও সম্পাদনা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমধর্ম বিষয়ে তাঁর লেখা একটি ইংরাজী গ্রন্থ ইউরোপ-আমেরিকার বহু বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

দীর্ঘকাল ইউরোপ-আমেরিকায় বাস করা সত্ত্বেও অমৃতলাল আনুষ্ঠানিক হিন্দু ধর্মে আস্থা হারাননি। বেদ-উপনিষদ্‌-গীতা ও পুরাণ সম্মত সনাতন হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও তার দার্শনিক মতবাদ প্রচারের জন্য হোপ সম্পাদনকালেই তিনি ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'হিন্দু ম্যাগাজিন' নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রটি দীর্ঘজীবী হয়নি। হোপ পত্রের আদর্শ ছিল জাতিকে আত্মনির্ভরতার শিক্ষাদান। সদ্য প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতি হোপ পত্রে কঠোর ভাবে সমালোচিত হতো। ইংরাজের সদভিপ্রায় ও মহত্বে অমৃতলালের বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। দিনের পর দিন তিনি হোপ কাগজের সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই মত প্রকাশ করতেন যে সব ইংরাজই ব্রিটিশ স্বার্থের ধারক ও বাহক, ব্যক্তিগতভাবে সৎ ব্রিটিশ শাসকের উপর ভারতবাসীর কোন আস্থা স্থাপন উচিত নয়। সাধারণ ইংরাজেরা ভারতবাসীদের সঙ্গে কৃষ্ণকায় হিসেবে যে দুর্ব্যবহার করে এই 'কালা ধলা' সম্পর্ক নিয়েও অমৃতলাল তাঁর কাগজে তীব্র প্রতিবাদ করতেন। ইউরোপীয় সম্পাদিত সংবাদপত্রগুলির ভারত-বিদ্বেষ প্রচারের বিরুদ্ধেও অমৃতলালের লেখনী সক্রিয় ছিল। ভারতবিদ্বেষী কাগজগুলির বক্তব্যের প্রতিবাদে হোপে নিয়মিত ব্যঙ্গচিত্র (কার্টুন), প্রকাশিত হতো। সম্ভবত সংবাদপত্রে কার্টুন প্রকাশের রীতি অমৃতলালই প্রবর্তিত করেন! স্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার প্রায় এক যুগেরও পূর্বকাল থেকে অমৃতলাল শিল্প বাণিজ্য বিস্তারের দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। ইউরোপ আমেরিকার উন্নতির মূলে যে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি—এ বিষয়ে দেশবাসীকে অবহিত করাই ছিল অমৃতলালের লক্ষ্য। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ভারত কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল। ব্রিটিশ তার জাতীয় স্বার্থে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস করে দিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে কৃষিই হয়ে উঠেছিল জনসাধারণের জীবিকার একমাত্র উপায়, এতে আবাদযোগ্য জমির উপর যথেষ্ট চাপ পড়তো। কৃষির উৎপাদনও বিলেতে চালান হয়ে যেত। সপ্তদশ-

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালীর প্রধান জীবিকা ছিল শিল্প-বাণিজ্য। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হওয়ার পর সম্পন্ন বাঙালী সমাজ ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে জমিদারি কিনে বিলাসিতায় মন দেয়। বিদেশীরা এই সুযোগে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য একচেটিয়া করে নিয়েছিল। এমন কি কৃষিও বিদেশী নীলকরদের হাতে চলে যায়। হোপের মাধ্যমে দেশবাসী বিশেষ করে বাঙালী সমাজকে শিল্প-বাণিজ্য প্রবর্তনে উৎসাহিত করেই অমৃতলাল ক্ষান্ত হননি। তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে তাঁর এক বন্ধু হেমচন্দ্র মিত্রের সহায়তায় একটি সুতি ও বস্ত্রবয়ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন (Bengal Weaving and Spinning Mill)। এই কারখানায় সুতি তৈরি হতো ও এই সুতি থেকে কাপড় বোনা হতো। দুর্ভাগ্যের বিষয় ইংলণ্ডে উৎপন্ন সুতি ও বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাঙালীর শ্রমে প্রস্তুত সুতি ও বস্ত্রের চাহিদা ছিল না। বাঙালী তখনও স্বদেশীদ্রব্যের মর্যাদা উপলব্ধি করতে অভ্যস্ত হয়নি। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই। দীন দুঃখিনী মা যে মোদের এর বেশী আর সাধ্য নাই।'—এই মন্ত্রটি তখনও বাঙালীর কানে পৌঁছোয়নি, মর্মে প্রবেশ তো দূরের কথা। উপযুক্ত বাজারের অর্থাৎ চাহিদার অভাবে অমৃতলাল ও তাঁর বন্ধুর সৃষ্ট বেঙ্গল স্পিনিং ও উইভিং মিলটি লোকসান খেতে খেতে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায় (H. P. Ghosh —Amritabazar Patrika dated 11. 12. 1955)। এই ঘটনায় অমৃতলাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও মনোবল হারাননি।

এই সময়েই তিনি আর একটি 'স্বদেশী' উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর এই উদ্যোগ 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে কোম্পানি' অবশ্য সাফল্য মণ্ডিত হয়েছিল। হোপ পত্রিকা প্রকাশের অল্প কিছুদিন পর হুগলী জেলার সিতি পলাশী গ্রাম নিবাসী অন্নদাপ্রসাদ সিংহরায় (১৮৫৫-) নামে একজন রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার অমৃতলালের কাছে এই মর্মে একটি প্রস্তাব নিয়ে আসেন যে হুগলী জেলার তারকেশ্বর থেকে মগরা পর্যন্ত একটি ন্যারোগেজ রেল লাইন পাতা হলে একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহু লোকের উপকার হবে। ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের (বর্তমান ইস্টার্ণ রেলওয়ে) মেন লাইন বা প্রধান পথের শেওড়াফুলি স্টেশন থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত একটি শাখা রেলপথ (ব্রাঞ্চ লাইন) ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে খোলা হয়। তারকেশ্বরের পর পশ্চিম দিকে বিস্তৃত একটি কৃষি সমৃদ্ধ অঞ্চলে আর কোন রেলপথ ছিল না, এতে জনসাধারণের খুবই অসুবিধা হতো। অন্নদাপ্রসাদ পেশায় ছিলেন রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার। তিনি প্রস্তাবিত রেলপথের একটি খসড়া

পরিকল্পনা প্রস্তুত করে তা অমৃতলালের হাতে দেন। নিজের চেষ্টায় প্রবাসে কর্মরত রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার অন্নদাপ্রসাদের পক্ষে এই প্রস্তাবিত রেলপথ পাতার মূলধন এমন-কি জনমত আকর্ষণও অসম্ভব ছিল। হোপ পত্রের পাঠক হিসেবে শিল্পোদ্যোগ স্থাপনে অমৃতলালের উৎসাহ এবং দেশে তাঁর প্রতিষ্ঠার কথা জেনেই অন্নদাপ্রসাদ অমৃতলালের কাছে প্রস্তাবটি পেশ করেন। অন্নদাপ্রসাদ অন্যান্য ব্যক্তিদেরও তাঁর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন কিন্তু সম্ভবত কেউ তাতে সাড়া দেননি। অমৃতলাল অন্নদাপ্রসাদের পরিকল্পনাটি নিয়ে নিজে অনেক চিন্তা করেন, বহু বিশেষজ্ঞের পরামর্শও তিনি গ্রহণ করেন। পরিকল্পনাটি কার্যকর করা সম্ভব এবং এই পরিকল্পনাটি কাজে পরিণত হলে বহু-জনের কর্ম-সংস্থান ছাড়াও ঐ অঞ্চলে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির সম্ভাবনার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে অমৃতলাল কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। সর্বপ্রথম তিনি গভর্নমেণ্টের অনুমতি নিয়ে 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে কোম্পানী' নামে একটি কোম্পানী স্থাপন করেন। কোম্পানী ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে রেজেস্ট্রি করা হয়। বঙ্গীয় সরকার ব্যতীত, হুগলী জেলা বোর্ডের সঙ্গেও নূতন রেলপথ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কোম্পানীকে চুক্তি পৃথক চুক্তি করতে হয়। ১০ টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রি করে মোট ন'লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে এই কোম্পানীর কাজ শুরু হয়। অমৃতলাল নিজে এই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কোম্পানী প্রতিষ্ঠার সময় উত্তরপাড়ার জমিদার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯২২) পরিচালক বোর্ডের সভাপতি (চেয়ারম্যান) নির্বাচিত হন। ইনিই সবচেয়ে বেশি টাকার 'শেয়ার' কিনেছিলেন। পরিচালকমণ্ডলী বা 'বোর্ড অব্ ডিরেক্টরস' এর অন্যান্য সদস্য ছিলেন—নন্দলাল গোস্বামী (শ্রীরামপুর) চণ্ডীলাল সিংহ (দেবীপুর), জানকীনাথ রায়, কানাইলাল খান, রায় বাহাদুর ঈশান মিত্র (চেয়ারম্যান হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটি) ও রায়বাহাদুর রামগতি মুখোপাধ্যায়। রামগতিবাবু 'ত্রিহুত স্টেট' রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, এঁর পেশাগত অভিজ্ঞতা বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়তা করেছিল। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী রেজেস্ট্রি হওয়ার পর রেলপথের জন্য জমি সংগ্রহ করে, রেলপাতার কাজ শুরু হয়। প্রথম দিকে এই রেলপথের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বয়ং অন্নদাপ্রসাদ সিংহরায়, পরে ধনকৃষ্ণ বসু তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সহকারী ইঞ্জিনীয়ার ও ওভারসিয়াররূপে কাজ করেন যথাক্রমে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও নলিনবিহারী ঘোষ।

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারকেশ্বর থেকে রুদ্রাণী পর্যন্ত ১২½ মাইল ন্যারোগেজ রেলপথে (২´—৬´´) রেল চলাচল শুরু হয়।

রুদ্রাণী থেকে মগরা পর্যন্ত আরও ১৮·১২ মাইল পথে রেল চলাচল শুরু হয় ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ৮ই মার্চ। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২রা এপ্রিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির তদানীন্তন লেঃ গভর্নর (ছোটলাট) সার চার্লস এলিয়ট তারকেশ্বরে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই রেল পথের উদ্বোধন করেন। তারকেশ্বর থেকে মগরা পর্যন্ত এই ৩২ মাইল রেলপথ পাততে কানানদী, কানাদামোদর, ঘিয়া ও কুন্তী নদীর উপর চারটি সেতু নির্মাণ করতে হয়েছিল। প্রতি মাইল রেলপথ বসানোর জন্য খরচ পড়েছিল প্রায় ২৯ হাজার টাকা। CE. Buckleend প্রণীত 'Bengal under the Lt. Governor' গ্রন্থে এই রেলপথ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করে বিশেষভাবে লেখা হয়েছে যে দেশীয় উদ্যোগে সর্বপ্রথমে এই বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়েই চালু হয় (২য় খণ্ড, ১৯০২, পৃঃ ৯৩৪)। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে মগরা থেকে গঙ্গাতীরবর্তী ত্রিবেণী পর্যন্ত আর ৩·১৫ মাইল রেলপথ খোলা হয়েছিল। অতঃপর সমগ্র রেলপথটির দৈর্ঘ্য হয় ৩৩·২৭ মাইল। স্টেশনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল পনেরটি। এর আরও কিছুকাল পর ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর এই রেলপথের দশঘরা স্টেশন থেকে বর্ধমান জেলার জামালপুর অর্থাৎ দামোদর নদের পূর্ব তীর পর্যন্ত আরও ৮·৩১ মাইল বা ১৩·৪ কিঃ মিঃ রেলপথ সম্প্রসারিত হয়। এই শাখা রেলপথে স্টেশনের সংখ্যা ছিল ৪টি। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে কোম্পানীর হেড্ অফিস খোলা হয়েছিল প্রথমে ৩০০, বহুবাজার স্ট্রীটে (বর্তমানে বি বি গাঙ্গুলী), পরে এই অফিস কাজের সুবিধার জন্য মগরায় স্থানান্তরিত হয়। রেলের কারখানা খোলা হয়েছিল তারকেশ্বরে। ফোরম্যান, মিস্ত্রি সবই ছিল বাঙালী, ক্বচিৎ দু একটি য়্যাংলোইণ্ডিয়ান। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে কোম্পানীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পরবর্তী সময়ে কলকাতার আশে পাশে ম্যাকলিয়ড্, মার্টিনবার্ণ প্রভৃতি কোম্পানী কর্তৃক আরও কয়েকটি ন্যারোগেজ রেলপথ প্রবর্তিত হয়েছিল। ১৮৯০ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত হোপ কাগজের স্বর্ণযুগ এর প্রচার ও প্রভাব তুঙ্গে পৌছেছিল, বিশেষ করে ছাত্র-সমাজে এই কাগজটি ছিল খুবই জনপ্রিয়। অমৃতলাল অত্যন্ত অমায়িক সহৃদয় ও সদালাপী ছিলেন, এই কারণে হোপ কার্যালয় তখনকার দিনের বহু বিশিষ্ট বিদগ্ধজনের মিলনকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। হোপেরই আসরে নিয়মিত আসতেন ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষাবিদ ও দেশপ্রেমিক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯৪৮) সাহিত্যিক ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৮৭ -১৯১৮) নাট্যকার ও অভিনেতা অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) প্রখ্যাত অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, (১৮৫০-১৯০৯) অধ্যাপক ও ঐতিহাসিক বিপিনবিহারী গুপ্ত (১৮৭৫-১৯৩৬) নাম উল্লেখযোগ্য। দুঃখের বিষয় যে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর থেকেই হোপ পত্রের দুর্দিনের সূচনা হয়। বাঙালীর একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উৎসাহে সম্ভবত অমৃতলাল সাময়িকভাবে এই কাগজের জন্য অপেক্ষাকৃত কম মনোযোগী হয়ে পড়েছিলেন। ১৮৯৫ পর থেকে দেখা গেল কাগজের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে সেই অনুপাত আয়ের অঙ্ক যথেষ্ট অল্প। বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং কর্মঠ ব্যক্তি হলেও অমৃতলালের বিষয়-বুদ্ধি বা স্বার্থপরতা নিতান্ত কম ছিল। জনপ্রিয় একটি পত্রিকা সম্পাদক অমৃতলালের কাছে বহুলোক অর্থ সাহায্যের জন্য আসত। অমৃতলাল হোপের তহবিল থেকেই এদের অর্থ সাহায্য করতেন। এমন ঘটনাও জানা গিয়েছে যে কোন দরিদ্র ছাত্র পরীক্ষার ফি জোগাড় করতে না পেরে অমৃতলালের কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছে, হোপের তহবিল সেদিন শূন্য। অমৃতলাল তাকে পরের দিন দুপুরে আসতে বলেছেন। পরের দিন দুপুরবেলা মনি অর্ডারে হোপের জন্য যে টাকা চাঁদা হিসেবে এসেছে সেই টাকা থেকে অমৃতলাল ছাত্রটির প্রার্থিত অর্থ তাকে দান করেছেন। ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৭ এই দুই বৎসরে হোপের দেনা এইভাবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দাঁড়িয়েছিল। দেনার দায়ে প্রেস বিক্রি করার পরও প্রচুর টাকা ঋণ থেকে যায়। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে হোপ কাগজের শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ঠিক দশবছর আগে এই জুন মাসেই হোপের আবির্ভাব হয়েছিল। হোপ কাগজটিই আমেরিকা থেকে ফেরার পর অমৃতলালের জীবিকার উপায় ছিল। নবগঠিত বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে কোম্পানীর সেক্রেটারী ও পরিবহন অধিকারিকরূপে অমৃতলাল যৎসামান্য ভাতা নিতেন। এতে জীবিকা নির্বাহ সম্ভব ছিল না। ইতিমধ্যে প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে কোম্পানী অনেকটা স্বয়ম্ভর হয়ে উঠেছিল, কর্মচারীদের বেতনও নিয়মিত দেওয়া হতো। কিন্তু অমৃতলাল এই কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন না, ছিলেন সর্বময় কর্তা। এই পদের উপযুক্ত বেতন দেওয়ার সামর্থ্য নবগঠিত কোম্পানীর ছিল না। হোপের বিলুপ্তির পর প্রায় এক বছর অমৃতলাল বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের সেক্রেটারী ও মুখ্য পরিবর্তন অধিকর্তার কাজ চালিয়ে যান। কিন্তু এর দ্বারা তাঁর জীবিকা নির্বাহ সম্ভব ছিল না। হোপ সম্পাদকরূপে অমৃতলালের নাম বাঙলার বাইরেও

ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময়ে এলাহাবাদ শহরে উত্তর প্রদেশের তালুকদারদের উদ্যোগে, 'এক্সপ্রেস' নামে একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রবর্তিত হয়। তাঁরা অমৃতলালকে এই পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানান। অমৃতলাল আনন্দের সঙ্গে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে এলাহাবাদে চলে আসেন। দুই বৎসর কাল এক্সপ্রেস সম্পাদনা করার পর ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে লাহোরের বিখ্যাত 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণের জন্য অমৃতলালকে আমন্ত্রণ করা হয়।

উত্তর ভারতে জাতীয়তাবাদ প্রচারের সময় তদানীন্তন কালের দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) পাঞ্জাব প্রদেশে জাতীয়তাবাদী সংবাদ পত্রের অভাব লক্ষ্য করেন ও এবিষয়ে তিনি পাঞ্জাবের স্থানীয় জননেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন।

সর্দার দয়াল সিং মাজিথিয়া নামে লাহোরের এক ধনী, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শিখ ভদ্রলোক সুরেন্দ্রনাথের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও একটি সংবাদপত্রের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করতে সম্মতি দেন। সর্দার মাজিথিয়ার অনুরোধে সুরেন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে একটি প্রেস ক্রয় করে পাঠান। প্রস্তাবিত ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র ট্রিবিউনের সম্পাদক নির্বাচনের ভার সুরেন্দ্রনাথকে দেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথ ঢাকা নিবাসী এক তরুণ যুবক শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে (১৮৫৬-১৮৯৭) এই পত্রের সম্পাদক নির্বাচিত করে পাঠান। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে লাহোর থেকে সর্বপ্রথম সাপ্তাহিকরূপ ট্রিবিউন পত্রটি প্রকাশিত হয়। ট্রিবিউনের প্রধান সম্পাদকীয় লেখক হন—এলাহাবাদ নিবাসী শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সর্দার দয়াল সিং মাজিথিয়াকে ট্রিবিউন প্রকাশে ও পরিচালনায় অন্যান্য যাঁরা সাহায্য করেন তাঁদের অনেকেই ছিলেন লাহোর প্রবাসী বিশিষ্ট বাঙালী। এঁদের মধ্যে রেভাঃ গোলকনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮১৭-১৮৯১) লাহোর হাইকোর্টের বিখ্যাত আইনজীবী পরে প্রধান বিচারপতি স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯১৭), কালীপ্রসন্ন রায়, যোগেশচন্দ্র বসু প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে বিপিনচন্দ্র পাল ট্রিবিউন পত্রের সহকারী সম্পাদক পদে কাজ করেছিলেন কিন্তু কিছুদিন পর তিনি পদত্যাগ করেন। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সর্দার দয়াল সিং মাজিথিয়ার পরলোক গমনের পর একটি ট্রাস্ট্রী বোর্ডের উপর ট্রিবিউন পরিচালনার দায়িত্ব পড়েছিল, এই সময়ে ট্রিবিউন ত্রি-সাপ্তাহিকরূপে অর্থাৎ সপ্তাহে তিন দিন প্রকাশিত হতো। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ট্রিবিউনের সম্পাদন

ভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ ট্রিবিউন সম্পাদক পদত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে আসেন। অতঃপর অমৃতলাল ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে মাসিক পাঁচশো টাকা বেতনে ট্রিবিউন পত্রের সম্পাদন ভার নিয়ে লাহোরে আসেন। অভিজ্ঞ সম্পাদক অমৃতলাল ট্রিবিউন পত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন, সমগ্র পাঞ্জাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০০ থেকে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অমৃতলাল ট্রিবিউন পত্রের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়টি ছিল তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। এই সময়ের মধ্যে অমৃতলাল হোম কাগজের জন্য বাকি ঋণের অধিকাংশ ভাগ শোধ করে ফেলেন। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে অমৃতলালের সহধর্মিনী হেমন্তকুমারী পরলোক গমন করেন। তাঁদের দুটি কন্যা ও একটি পুত্র ছিল। স্ত্রীর মৃত্যুতে অমৃতলাল বিশেষ মর্মাহত হন। দুর্ভাগ্যক্রমে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদের ফলে তাঁকে এই সময়েই ট্রিবিউনের সম্পাদক পদ ত্যাগ করতে হয়—তাঁর আত্মসম্মান জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর ছিল। তবে দীর্ঘকাল তাঁকে কর্মহীন অবস্থায় থাকতে হয়নি। দেশনায়ক লালা লাজপত রায় তাঁকে তাঁর প্রবর্তিত ইংরাজী সাপ্তাহিক 'পাঞ্জাবী' পত্রের সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন। অমৃতলালের পরে বহু বিশিষ্ট বাঙালী ট্রিবিউন এবং পাঞ্জাবী পত্রের সম্পাদক ও সহকারী রূপে যুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) কালীনাথ রায় (১৮৭৮-১৯৪৫) কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, অমল হোম (মৃত্যু-১৯৪৫) সুধীরকুমার লাহিড়ী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯১০ থেকে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অমৃতলাল অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে পাঞ্জাবী পত্র সম্পাদন করেন। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে অমৃতলালের স্বাস্থ্য ভাঙতে শুরু হয়, ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল, নিয়মিত কোন কাজ করার সাধ্য ছিল না। পাঞ্জাবী পত্রের ঘোষিত সম্পাদক পদ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তবে মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রের জন্য তিনি প্রবন্ধ লিখতেন এবং সনাতন ধর্ম প্রচার সভায় বক্তৃতা দিতেন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে অমৃতলালের কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয়, এই সময় অমৃতলালের নিজের শারীরিক অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। জানা যায় যে পুত্র শোকে অমৃতলাল এত কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি এর পর কোন খাদ্য পানীয় গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এই অবস্থায় ৩০ জুলাই লাহোরেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রায় পাঁচ-ছ বৎসর অমৃতলাল লোক লোচনের অন্তরালে ছিলেন। সাধারণত এই অবস্থায় লোকের তাঁকে ভুলে যাওয়ার কথা। অমৃতলালের ক্ষেত্রে

অবশ্য তা হয়নি। তখনকার দিনে সর্বভারতীয় সংবাদ সরবরাহ সংস্থা 'এসোসিয়েটেড প্রেস' কর্তৃক তাঁর মৃত্যু সংবাদ যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে দেশের সব সংবাদ পত্রিকাগুলিতে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদটি ছিল—

"Lahore, July 30, 1921—Death occurred this morning at his residence in Lahore of Babu Amrita Lal Roy, one of the best known Indian Journalists of the older generation. Early in life he emigrated to England and America where he took an active part in labour movement···He founded and edited an English weekly 'Hope'.···became editor of the 'Tribune' and later of the 'Punjabee'. He had been in failing health for some years···he was a promoter of B. P. Rly···he was 62 years of age." A. P. (Published in the 'Statesman' of 31. 7. 21). অমৃতলালের হোপ সাপ্তাহিক পত্রটি একসময় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বেঙ্গলী সাপ্তাহিক পত্রের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। অমৃতলাল সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদকেও অনেক সময় তীব্র সমালোচনা করতেন।

এতৎসত্ত্বেও সুরেন্দ্রনাথ অমৃতলালের মৃত্যুতে তাঁর বেঙ্গলী কাগজে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন তার থেকে অমৃতলালের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার প্রমাণ পাওয়া যায়। অমৃতলালের মূল্যায়ণ হিসেবে এই সম্পাদকীয় মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের শুরু থেকে বেঙ্গলী দৈনিক পত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল—

"We have already announced the death at Lahore of Mr. Amrita Lal Roy, a well-known knight of the pen whose passion was for journalism and who in another country, would have made himself a centre of power and influence. The present generation in Bengal has no idea what a large place was filled by Mr. Roy in the field of Journalism and how his contributions have helped forward the present national movement. In early youth, he was sent to Edinburgh for medical studies but he found himself drifted in Newyork where for lack of any useful preoccupation at first, he did not think beneath his dignity to set his hands

to menial's work—described in his reminiscences "English-American" which we commend to our readers. Subsequently, Mr. Roy secured a good position for himself as a writer in Newyork. His article appeared in North American Review—unique one. After his return he started "Hope" and run it with conspicuous obility. It was intended as a paper for millions and was deservedly popular. To Mr. Roy belongs the credit of planning the B. P. Rly managed and controlled by his countrymen which is the only institution of the kind in the whole country. Time, B. P. Rly has not yet realised the requisite measure of success. But all honour to him who had forseen the potentialities of indigenous talent for the purposes of Rly development. It does one's heart good to see the Rly nourished by the powers of organisation of the Bengalees Laterly, Mr. Roy made the Punjab the scene of his journalistic activities. He was editor of the Tribune and also for sometimes of the Punjabee. His name will occupy an honoured place in the history of the Journalism in the Punjab. As a writer, Mr. Roy was a force to reckon with. Indeed there are few persons who could wield the resources of the English language with such perfect mastery. His writings were chaste, polished and dignified and his thoughts breathed fervour and his words literally burned. It will be long before the place undered void by the death of such an accomplished Journalist can be filled. We deeply regret his death, which means the loss to Bengal of one more worthy son and offer our sincerest condolence to the bevaved family." [Bengalee, 3. 8. 1921]

অমৃতলালের লেখনী যে কত শক্তিশালী ছিল ও তিনি কত দূর প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন বেঙ্গলী কাগজের এই সম্পাদকীয় মন্তব্যে তা পরিস্ফুট হয়েছে। লেখার ধরণ দেখে মনে হয় যে এটি স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথের লেখনী প্রসূত।

আরও লক্ষ্য করার বিষয় যে এই প্রবন্ধটিতে সুরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন যে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে অর্থাৎ পরাধীন ভারত ব্যতীত অন্যত্র জন্মালে অমৃতলাল বহু ক্ষমতার অধিকারী হতে পারতেন এবং বহুলোকের সম্মানাস্পদ হতে পারতেন। সুরেন্দ্রনাথ এখানে এটাই বলতে চেয়েছেন যে অমৃতলাল জীবদ্দশায় তাঁর প্রতিভা ও যোগ্যতার উপযুক্ত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

অমৃতলালের বড় সাধের হোপ কাগজ দেনার দায়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সৃষ্ট বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে কোম্পানী অবশ্য দীর্ঘ ৬২ বৎসর চালু থেকে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে কোম্পানীর অংশীদারদের সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্বেচ্ছায় এই কোম্পানীর অবলুপ্তি ঘোষিত হয়। এই সভার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কোম্পানীর যে বিষয়-সম্পত্তি এ সময় ছিল (essets) তা থেকে তিন বৎসরের মধ্যে সমস্ত দায় (liabilities) অংশীদারদের অর্থ সমেত মিটিয়ে দেওয়া যেতে পারবে। স্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে জানা যায় যে বিনা টিকিটের যাত্রীদের ভ্রমণ এই রেলপথের ক্রমাগত আর্থিক অবনতির একটি প্রধান কারণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এই ব্যবস্থার সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা এবং বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার দাবীতে এবং বি-পি-আর রেলকর্মীদের রাজনৈতিক নেতাদের প্ররোচনায় পুনঃ পুনঃ ধর্মঘট জনিত ক্ষতিও বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে বিলুপ্তিকে ত্বরান্বিত করেছিল। বাঙলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাঙালীর নিজস্ব এই প্রতিষ্ঠানটি বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোম্পানীর সম্পত্তি বন্ধক রেখে প্রায় দু লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেন। শ্রমিক ধর্মঘট মীমাংসার জন্যও তিনি চেষ্টা করেন—কিন্তু শ্রমিক নেতাদের অনমনীয় মনোভাবের জন্য তাঁর এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের আশেপাশে মার্টিন কোম্পানীর মতো কয়েকটি বিদেশী কোম্পানীর কয়েকটি ছোট রেল লাইন (ন্যারোগেজ) প্রবর্তন করেছিল। ১৯৫২খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় রেলপথ পুনর্বিন্যাসের পর আর্থিক আঘাতে বি-পি-রেলওয়ের মতো ধীরে ধীরে অধিগ্রহণ করে এগুলিকে কলকাতা-কেন্দ্রিক বর্তমান ইস্টার্ণ রেলওয়ে বা সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে, কোন কোন রেলওয়েকে ব্রডগেজেও রূপান্তরিত করা হয়েছে। অনুরূপ আরও কয়েকটি প্রকল্প ইতিমধ্যেই অনুমোদিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় একান্তভাবে বাঙালীর সৃষ্ট বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়েকে পুনরুজ্জীবিত করার কোন চেষ্টা এ যাবৎ হয়নি।

হুগলী জেলার বিস্তৃত পশ্চিমাঞ্চল ও বর্ধমান জেলার একাংশের লক্ষ লক্ষ মানুষ ৬২ বৎসর ধরে যে সুবিধা ভোগে অভ্যস্ত হয়েছিলেন ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে তাঁরা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। বি-পি-আর আজ স্মৃতিতে পর্যবসিত।

অমৃতলাল প্রায় এক যুগ ধরে যে ট্রিবিউন পত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সৌভাগ্যক্রমে সেই পত্রটি এখনও বহু বাধা বিপত্তি জয় করে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৈনিক-পত্র রূপে বেঁচে আছে। স্বনামধন্য বাঙালী সাংবাদিক কালীনাথ রায় ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ট্রিবিউন সম্পাদনায় বৃত ছিলেন। জালিওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ও পাঞ্জাবে দমন নীতির প্রতিবাদ করার জন্য কালীনাথ এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, তাছাড়া তাঁর ১০০০৲ জরিমানা হয়। পরে এক বৎসর কারাদণ্ডের পরিবর্তে কালীনাথকে তিনমাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। কালীনাথকে গ্রেপ্তারের পর তিনদিন ট্রিবিউন কার্যালয় তালা বন্ধ রাখা হয়। কারামুক্ত কালীনাথ পুনরায় ট্রিবিউন সম্পাদনার ভার নিয়ে একাদিক্রমে ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত ট্রিবিউন পত্রের সম্পাদক পদে বৃত ছিলেন।

দেশ বিভাগের অব্যবহিত পূর্বকালে অবিভক্ত পাঞ্জাবে বিশেষ করে লাহোরে সাম্প্রদায়িকতা অতি নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্ট ট্রিবিউন পত্রের অফিস আক্রান্ত হয়। দুইজন কর্মী ছুরিকাহত হয়ে মারা যান। চল্লিশ দিন বন্ধ থাকার পর সেপ্টেম্বর মাসে ট্রিবিউন কার্যালয় সিমলায় স্থানান্তরিত হয়। পরের বৎসর মে মাস থেকে ট্রিবিউনের আপিস আম্বালায় (বর্তমান হরিয়ানা রাজ্য, তখনকার পূর্ব পাঞ্জাব) স্থানান্তরিত হয়।

অমৃতলাল সম্পাদিত হোপ পত্রিকা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। জাতীয় পাঠাগারে এর কোন ফাইল নেই। সুরেন্দ্রনাথ অমৃতলাল লিখিত যে ইংরাজী স্মৃতিকথা উল্লেখ করেছিলেন সেটিও দুষ্প্রাপ্য। ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাস বিষয়ে যে কয়টি বই আছে সেখানে অমৃতলাল রায় বা তাঁর হোপ কাগজের উল্লেখ দেখা যায় না। বিপিনচন্দ্র পালের ইংরাজী ও বাঙলা স্মৃতিকথায় হোপ বা অমৃতলাল রায়ের নাম উল্লিখিত হয়নি। গভীর পরিতাপের বিষয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বিখ্যাত মনীষী ও দেশপ্রেমিক শতবর্ষের মধ্যে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন।

শামসুর রহমানের কবিতা

বাহারউদ্দিন

ক.

এক পরিশীলিত ও বিশ্লেষণমুখী ব্যাখ্যার শুরুতেই, শামসুর রহমানকে তিরিশোত্তর বাংলা কবিতার প্রধানতম[১] কবি হিসেবে সম্মানিত ও চিহ্নিত করেছেন হুমায়ুন আজাদ। হুমায়ুনের এই চিহ্নিত করণের পরিধি সংক্ষিপ্ত, তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও অনায়ত। প্রসঙ্গত, মাত্র দুজন কবির কথাই উল্লেখ করেছেন তিনি, কবিদের একজন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অন্যজন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু নিজের বিশ্বাস ও তদনুগ 'সত্য' প্রকাশে দুই কবির চার ও তিন দশকের সময়মগ্ন কিংবা স্বাতন্ত্র্য-লব্ধ ফসলের সঙ্গে, শামসুর রহমানের 'ব্যাপক গভীর'[২] কবি-কর্মের আপেক্ষিক আলোচনায় অগ্রসর হননি হুমায়ুন। কেন হননি জানি না। হলে ভাল হোত।

হুমায়ুনের প্রধান যুক্তি হল, তিরিশের পাঁচ মহৎ আধুনিকের পর, চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে, কিংবা হালেও, শামসুর রহমানের মতো কেউই অনুপূর্ব বিস্তৃতি ও গভীরতা অর্জনে সক্ষম হননি, কেউই তাঁর মতো হতে পারেননি বহুগামী। তাই তিনি—শামসুর রহমানকে তিরিশোত্তর বাংলা কবিতার প্রধানতম, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন।

হুমায়ুন আজাদের মতো অন্তর্দর্শী, মেহনতি ও তুখোড় কবিতা সমালোচকের পক্ষেই এই ধরনের দুঃসাহসিক উক্তি করা সম্ভব। তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশের,

এমনকি হালের অখণ্ড কবিতা-ফসলকে সামনে রেখে, উক্তির যথার্থতা-প্রমাণে নিরত হওয়াও তাঁর সাধ্যাতীত নয়। তাঁর এই মেধা আছে, কবিদের মনোবিশ্ব ও বহির্বিশ্ব খতিয়ে দেখার সার্বিক দৃষ্টিও তাঁর আছে। প্রণালীবদ্ধ বিশ্লেষণ ও গবেষণা-বিন্যাসেও বাংলাদেশে তাঁর জুড়ি পাওয়া ভার। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, এরপরও একটি সমস্যা থেকে যায়। এখানেও থেকে গেছে। সমস্যাটি যুক্তি ও অন্তর্নিহিত আবেগের। তাদের প্রাধান্যের।

গল্পের, যে-কোন শিল্প মাধ্যমের সুফসল সহজলভ্য এবং তার অন্তর সুগম্য হলে, সেই সুফসলকে শ্রেষ্ঠ ফসল বলে সনাক্ত করা মেধাবানের পক্ষে মোটেই দুঃসাধ্য নয়। কেননা প্রতিভা এমনই একটি জিনিস, তার যুক্তি এরকমই একটি সর্বগ্রাসী অস্ত্র। কিন্তু যুক্তির সঙ্গে সূক্ষ্ম বিচারবোধ নামক চৈতন্যের যদি সামঞ্জস্য না ঘটে, যদি এই দুই অমিত শক্তির আঁতাত সৃষ্টি না হয় তাহলে যুক্তি সর্বস্ব মূল্যায়ন খণ্ডিত ও পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে যায়। শিল্প-সমালোচনায় যুক্তি যেমন অপরিহার্য, যুক্তি-আবেগের নিয়ন্ত্রণে, দুই শক্তির ভারসাম্য রক্ষায়, বিচার-মাপকের ভূমিকাও অপরিত্যাজ্য—টি. এস. এলিয়ট ও এফ. আর. লিভিসের বৈপ্লবিক বহু সিদ্ধান্ত ও বিশ্লেষণের পর, আজ অন্তত, একথাও চিরসত্য। পাউণ্ডের এপদী মননের গুরুত্বও আমাদের একই সঙ্গে জ্যামিতিক ও গাণিতিক শিক্ষার সন্ধান দেয়। বাংলা কবিতার অগ্রতম প্রধান শিক্ষক বুদ্ধদেব বসুই তিরিশের পরেও, সমালোচনার এই বিজ্ঞান-প্রণালী এড়িয়ে যান সযত্নে। তাঁর নির্ভেজাল বঙ্গীয় ও রোমান্টিক চেতনাই এর বিরোধী ছিল। তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল ইতিহাস-বিমুখ জীবনবোধই সহায়ক ছিল এই বিরোধের। বুদ্ধদেব বসুর ক্রমবর্ধমান প্রভাবের বিরূপ প্রতিক্রিয়াই সম্ভবত সমকালের সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দেকে বেছে নিতে হয় দুর্গম পথ। আমৃত্যু সুধীন্দ্রনাথের, এবং কয়েকদশক অব্দি বিষ্ণু দের কাব্যভাষা ও কাব্যবিষয়ই শুধু জটিলতা-মগ্ন নয়, দুজনের কাব্যতত্ত্বের প্রকাশও জটিল, বাস্তব ও ক্ল্যাসিকধর্মী। সুধীন্দ্রনাথ স্বধর্মে অবিচ্যুত থেকেছেন আমৃত্যু, বিষ্ণু দের অতি বাস্তবী হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে ধর্মচ্যুত করেছে, বিশেষ করে কাব্যবিষয়ে, কাব্যভাষায় তিনি আশ্রয়ী হয়ে ওঠেন তরলতার। এই তিন বেপরোয়া, অতি হিসেবী এবং খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত অশ্বারোহীর বিশ্লেষণ-দ্যুতি আজও প্রভাবিত করে যাচ্ছে বাংলা কবিতার শুদ্ধ ভাষ্যকে।

কবিদের মনন ও কবিতার বহিরঙ্গ ব্যাখ্যায় সুধীন্দ্রনাথ আজও অজেয়। সুধীন্দ্র-

নাথের জটিল ভাষা, তৎসম ও তদ্ভব শব্দের প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং আপাতকঠিন বাক্যগঠন আজও তাঁর সন্ততিদের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, অন্যদিকে বুদ্ধদেবের রোমান্টিক মনও এক বড় অংশের স্বপ্নবিহারের কেন্দ্রবিন্দু। তবে তাঁর ভাষার গতি, চাঞ্চল্য, সমার্থক শব্দ ব্যবহারের ঝোঁক, অত্যধিক কমা ব্যবহার আর কাউকেই প্রায় আকৃষ্ট করে না। কিন্তু, যেহেতু বাঙালিজীবনে যুক্তি এবং বিচারবোধের অবাধ প্রসার ঘটেনি আজও, সেজন্যেই তাঁর কল্পলোক সংক্রামিত করে যাচ্ছে এখনও। বলা বাহুল্য, এই দুই মননের মিলনেই শুদ্ধতম ভাষ্যকারদের অধিক আগ্রহ। তিরিশীদের পর, পঞ্চাশীরা এখনও বাংলা কবিতার মুখ্য সচেতক। কাব্যবিষয় ও কাব্যভাষায় তিরিশ-পঞ্চাশের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে তাঁরা যেমন উন্মুখ, উভয়ের বিশ্লেষণ ধর্মেও তাঁরা একইভাবে মিলন-চিন্তার অনুসারী। অলোকরঞ্জন, শঙ্খ ঘোষই ভিন্ন পথের অভিসারী। শঙ্খ ঘোষের বিশ্লেষণী মন আবু সয়ীদ আইয়ুবের পরমাত্মীয়। আইয়ুবের আদি উন্মেষ তিরিশের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হলেও, তাঁর বিস্তৃত প্রকাশ মূলত পঞ্চাশ, ষাট, এমনকি সত্তরের শেষ পাদেও। আইয়ুবের অক্লান্ত অন্বেষা, বৈজ্ঞানিক আপেক্ষিকতত্ত্ব ও অত্যাধুনিক দর্শন চিন্তার সঙ্গে তাঁর ঘন ঘন প্রণয় তাঁকে তিরিশীদের জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়, এগিয়ে নেয় আমৃত্যু। আইয়ুবের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতাময় এবং গতিশীল জীবনবোধ উৎসাহিত করে, প্রকারান্তরে শঙ্খ ঘোষকেও। তিনিও হয়ে ওঠেন প্রশ্নহীন আনুগত্যের সন্ধানী। পঞ্চাশীদের সমন্বয়-জগত থেকে তাঁর স্বেচ্ছা নির্বাসন তাঁকে এক ঐশ্বর্যমণ্ডিত মনোবিশ্ব ও ভিন্ন জগতের খবর দেয়। এই ভিন্ন জগতেই তিনি আত্মস্থ, এই জগতকে কেন্দ্র করেই বাংলা কবিতার আলোচনায় তিনিও বহুদর্শী, স্ব-নির্ভর।

পূর্বখণ্ডে, পঞ্চাশের দশকে নানা কারণে, কবিতার সূক্ষ্ম আলোচনার উন্মেষ ঘটেনি। রাজনৈতিক কোলাহল ও বাঙালি মধ্যবিত্তের আমি অন্বেষাই প্রধানত এর অন্তরায়। তার শ্রেষ্ঠ মেধা কয়েক দশক ধরেই নিরত থাকে সমাজ-মানস ও গুরুত্ব বিশ্লেষণে, আজও এই বিশ্লেষণের ঝোঁক সর্বাধিক, তাই কবিতা বিষয়ক শুদ্ধ ভাষ্য গুরুত্ব পায়নি দীর্ঘকাল। ষাটের দশকে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের সমাধান অনেকটা সহজ হয়ে এলে, কবি ও কবিতার শুদ্ধ-আলোচনায় অগ্রসর হন কয়েকজন তরুণ, এঁরাও মূলত কবি, এঁরাও কলকাতা-কেন্দ্রিক পঞ্চাশীদের মতো সমন্বয়বোধের উপর গুরুত্ব দিয়ে শুরু করেন যাত্রা। এই যাত্রাপথের প্রথম যোদ্ধার নাম আব্দুল মান্নান সৈয়দ, এবং সর্বশেষ সফল সচেতকের

নাম হুমায়ুন আজাদ। কবিতা-বিশ্লেষণে হুমায়ুনের বিকাশ অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত, তবুও, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষা এবং বুদ্ধদেব বসুর অতি সংবেদের উত্তর সাধক তিনিও। প্রকাশভঙ্গীতে হুমায়ুন এপদী। অন্তর্নিহিত আবেগ বিচ্ছুরণে বুদ্ধদেবেরই সন্ততিদের একজন। হুমায়ুন গভীর বিশ্বাস ও ভালবাসা থেকেই শামসুর রাহমানকে তিরিশোত্তর বাংলা কবিতার প্রধানতম কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তাঁর আন্তরিকতা, বিশ্বাসের সততা অবশ্যই শ্রদ্ধেয়, তাঁর ভালবাসা অবশ্যই অপরিমেয়, কিন্তু এই চিহ্নিতকরণকে, এই বিশ্বাসকে খতিয়ে দেখার, বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা অজ্ঞাত কারণেই এড়িয়ে গেছেন তিনি। যুক্তির সঙ্গে বিচারবোধের প্রণয়ের প্রয়োজন ছিল, প্রণয় ঘটেনি, যুক্তি বিচারের সঙ্গমে উক্তিটি হতে পারত হয় জোরাল, অথবা শামসুর রাহমান অন্য অর্থে, অন্যভাবে হতে পারতেন সনাক্ত।

শামসুর রাহমান বাংলাভাষার অন্যতম প্রধান—বাঙালির 'বাংলাদেশ' নামক পূর্বখণ্ডের প্রধানতম কবি, এতে সন্দেহ নেই, সন্দেহ থাকতে পারে না। তাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের শ্রম, রেওয়াজ ও সাফল্যে এই সত্য আজ তর্কাতীত; কিন্তু তিনি তিরিশোত্তর বাংলা কবিতার প্রধানতম কিনা, একথা অবশ্যই প্রশ্ন ও তর্ক-সাপেক্ষ। কেননা, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার প্রধান কিংবা প্রধানতম এই শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে, আরও কয়েকজন কবিকে নিয়েও সমস্যা দেখা দেয়, কেননা তিরিশোত্তর বাংলা কবিতা সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আল মাহমুদ এবং সিদ্ধেশ্বর সেন ও আরো কয়েকজন পরিণত, প্রতিবেশময়, সমন্বয়মগ্ন এবং অন্তর্গামী কবিদের শিল্পকর্মে সমৃদ্ধ। চল্লিশ-পঞ্চাশের এই কবিকুলকে এড়িয়ে, ডিঙিয়ে, অন্তত এই মুহূর্তে, শামসুর রাহমানের দিকে পাল্লা ভারি করে দিতে আমার অন্তত দ্বিধা হয়।

শামসুর রাহমান নিঃসন্দেহে বাংলা কবিতার একজন গুরুত্বপূর্ণ, প্রথম সারির কয়েকজনের অন্যতম, তাঁর ব্যক্তিত্বে বাংলা কবিতা অবশ্যই সমৃদ্ধ, তাঁর ব্যাপকতা, প্রতিবেশ-মগ্নতা, সমকাল-চেতনা, সমকালের প্রতিটি দুর্যোগে তাঁর চৈচিয়ে ওঠার অসীম সাহস এবং সেই সাহস ও অভিজ্ঞতাকে শিল্পময় করে তোলার উজ্জ্বল কীর্তি অবশ্যই স্বীকার্য। তাই বলে, সমকাল তাঁর সৃষ্টিশীলতার মাঝপথে অন্তত, তাঁকে সমকালের শ্রেষ্ঠ কবির আখ্যায় চিহ্নিত করতে পারে না। কাউকেই পারে না।

খ.

১৯৪৮ সালের শেষের দিক থেকেই শামসুর রাহমানের কবিতা লেখার শুরু। প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'উনিশশো উনপঞ্চাশ,'[৩] কবিতাটি (অধুনা অবলুপ্ত,[৪]) প্রকাশিত হয় নলিনীকিশোর গুহ সম্পাদিত ঢাকার সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলায়'। শামসুর রাহমানের প্রথম গুচ্ছ-প্রকাশ উনিশশো পঞ্চাশে, আশরাফ সিদ্দিকী ও আব্দুর রশিদ খান সম্পাদিত ক্ষুদ্র নব্য সংকলন 'নতুন কবিতা'য়। এতে সঙ্কলিত হয় তাঁর ছ'টি কবিতা। এই ছ'টি কবিতাকেই প্রথম দৃষ্ট হয়ে ওঠে তরুণ কবির সন্ধানী মেজাজ। শোনা যায় ভিন্ন কণ্ঠ। উনিশশো ষাট ও তেষট্টি সালে প্রকাশিত প্রথম ও দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' এবং 'রৌদ্র করোটি'র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি হিসেবে তাঁর প্রতিশ্রুতি হয়ে ওঠে আরও গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বের দু'টি কারণ। একটি সমাজতাত্ত্বিক। অন্যটি কাব্যিক। সমাজতাত্ত্বিক কারণটি আগেই বিশ্লেষণ করা সঙ্গত। কারণ, শামসুর রাহমানের সৃষ্টি-চেতনার ধারাবাহিকতা, ক্রমপরিণতি এবং পরিমণ্ডলের অসফল কবি-কর্মকে এড়িয়ে, মাড়িয়ে, নতুন পথ খোঁজার চাবিকাঠিটি এখানেই নিহিত। এখানেই চড়াই-উতরাই পথের অভিযানী একজন তরুণের কবি-কণ্ঠ হয়ে ওঠে ঊর্ধ্বগামী, এখানেই প্রতিবেশের সংকীর্ণতা, সম্প্রদায়-চেতনার প্রথম অতিক্রমণ সম্ভব হয়ে ওঠে এবং এই বিরল অতিক্রমণ পূর্বখণ্ডে, একমাত্র আহসান হবিব ছাড়া তাঁর আর কোন পূর্বগামীর পক্ষেই সম্ভবপর হয়নি, এমনকি পশ্চিম খণ্ডে, এই কলকাতাতেও, তথাকথিত 'মাইনোরিটি' সমাজের অন্তর্ভুক্ত কবিদের কাছে এই পথ ছিল কণ্টকিত। পথ দুর্গম বলেই দেশভাগের পর, দীর্ঘদিন, কলকাতায় মুসলিম কবিদের বিকাশ ছিল অবরুদ্ধ। অবরোধের পিছনে মুসলমানদের ভয়, সংশয় ও হীনমন্যতা যেমন দায়ী, তথাকথিত সংখ্যাগুরুদের অহমিকা ও অবজ্ঞাও তেমনি কম দায়ী নয়। বাংলা কবিতারই দুর্ভাগ্য, জাতীয় বিকৃতির সংক্রমণ থেকে তার শরীর-আত্মাও রেহাই পায়নি বহুকাল, তাই একজন শুদ্ধ কবির চিত্ত বিশ্লেষণেও ভেদাভেদ চিন্তার অসুস্থ প্রসঙ্গ এসে পড়ল। এটাই আমাদের দুঃখ। আমাদের আরও এক ব্যর্থতা এখানেও। বলা উচিত, শামসুর রাহমানের আধুনিকতা ও তুখোড় নাগরিকতার আদি উন্মেষে এই অসুস্থতা, বিকৃতি, সম্প্রদায়-চেতনা, চিরায়ত-ধর্ম ও ঈশ্বরবোধ সতর্কতার সঙ্গেই অবহেলিত ও অস্বীকৃত। যে-কোন শিক্ষিত ও আধুনিকের কাছে, এসব বোধও নাগরিকতার কয়েকটি অতি আবশ্যিক শর্ত, নিশ্চিত

নাস্তিকতাও নিরপেক্ষ নাগরিক চেতনার সঙ্গে জড়িত; অতএব এসবের উল্লেখ ও বিশ্লেষণ অপরিহার্য। বিশেষ করে, শামসুর রাহমানের মতো, ইসলামী ও সামন্তবাদী পরিবেশে বেড়ে ওঠা, বড় হয়ে ওঠা একজন কবির স্বরূপ-দর্শনে এসব আপাত জটিল প্রশ্নের বিচার অত্যন্ত জরুরি।

মোহিতলাল মজুমদারই সম্ভবত বাংলা কবিতার প্রথম ঈশ্বর-নিরপেক্ষ কবি। প্রিয় কন্যার মৃত্যুর পর, তাঁকে চিৎকার করেই ঈশ্বরবোধের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানাতে দেখা গেছে, ঢাকায়। ঈশ্বর নামক 'নিরাকার চেতনা বিশেষ'কে নিয়ে তাঁকে মাথা ঘামাতেও হয়নি, কবিতায়ও বিষয়টি প্রশ্রয় পায়নি। রবীন্দ্র-চেতনার রহস্যে, তাঁর ফসলে, নিরীশ্বর-সত্য কেবল অস্বীকৃত ও বর্জিতই নয়, ছায়াবাদের নিশ্ছিদ্র কারাগারে বন্দীও; আর শুধু রবীন্দ্রনাথই নয়, তাঁর বলয়-কেন্দ্রেও নিরীশ্বর চেতনার বিকাশ একেবারে রুদ্ধ। সন্ধিক্ষণের নজরুল ইসলামের কবিতায়, দ্বিতীয় দশকে, এক সময় নাস্তিক্য বজ্রঘোষিত হয়ে উঠলেও, তাঁর আপাত বিরোধে, ঈশ্বর-নিরীশ্বর বোধের দ্বন্দ্বে, উত্তর-তিরিশে, তাঁর কবিতা ও গানে ছায়াবাদের বিপুল বিস্তারে, বাতিল হয়ে যায় উচ্চ নিনাদিত নাস্তিকতা। বিজ্ঞান-সুলভ নাস্তিকতা বাংলা কবিতায় প্রথম অভিনন্দিত হয় তিরিশের কবিতায়। তিরিশী কবিতার এই উত্তরাধিকারকে চরম দ্রোহিতার পর্যায়ে পৌঁছে দেন শামসুর রাহমান। স্রষ্টা, সৃষ্টি, আত্মা, নরক, স্বর্গ প্রভৃতি আস্তিক্য বাস্তব মহিমা-বোধ, ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে তাঁর পদাঘাতে। চিরায়ত মহিমার প্রতি তাঁর আক্রোশে ও অনাস্থার শুরু প্রথম কাব্যগ্রন্থেই, এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'রৌদ্র করোটি'তে এসে তা হয়ে ওঠে আরও প্রখর, তীক্ষ্ণ ও সর্বনাশা। 'চিরায়ত' ধারণার এই তছনছ দেখার জন্যে প্রস্তুত ছিল না পূর্বখণ্ডের মানসিকতা, সম্ভবত এই অপ্রস্তুতি এবং শামসুর রাহমানের বেপরোয়া স্বভাবও স্বদেশে তাঁর বিলম্বিত স্বীকৃতির অন্যতম কারণ।

বিশ্ব শতকীয়, এই নির্ভেজাল নাস্তিকতাবোধের অর্থেও, বস্তুত, শামসুর রাহমান বাংলাভাষার অন্যতম নাগরিক এবং পূর্বখণ্ডের প্রথম ও প্রধানতম নাগরিক কবি, তাঁর নাগরিকতার জটিলতা আরও বহুদিকে বিস্তৃত, আরও গভীরেও, মনোবিশ্বের অতলান্তেও এর জট ছড়ান। শামসুর রাহমানের বহুকেন্দ্রিক নাগরিকতাকে নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, অবান্তর প্রশ্ন; সৈয়দ আলী আহসান শামসুর রাহমানের নাগরিকতাবোধকে, 'অনেকটা বিদেশী'[৫] বলেও চিহ্নিত করতেও কুণ্ঠিত হননি। শামসুর রাহমানের দুর্ভাগ্য, কিংবা সৌভাগ্যও বলা যায়, যে

তাঁর কাব্য-ভাষাই নয় কেবল, তাঁর অতি আধুনিক কাব্য-বিষয়ও দীর্ঘদিন নিজের বাসভূমে বিড়ম্বিত হয়। একটি বড় মাপের, অতি গ্রহণশীল প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানানোর মতো সংবেদনশীল মনের দীর্ঘ অনুপস্থিতি এর প্রধান কারণ। দেশভাগ কেবল অবাঞ্ছিত সীমানাই এঁকে দেয়নি, বাঙালির শ্রেষ্ঠ সব মেধাকেও দ্বিখণ্ডিত করে দেয়। পূর্বখণ্ডের মেধা-শক্তির এক বড় অংশকেই যেহেতু চলে আসতে হয় কলকাতায়, শামসুর রাহমানকেও, মেধা-বিভাজনের এই করুণ পরিণতি মেনে নিতে হয় অনিচ্ছায়, স্বীকৃতির জন্যে। তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় অন্তত দেড় দশক। বিলম্বিত স্বীকৃতিই শেষ পর্যন্ত ফলবান হয়েছে। তাঁকে আরও পরিশ্রমী এবং উত্তরোত্তর স্বধর্মীয় চিত্রাঙ্কনে উদ্বুদ্ধ-করেছে। স্বীকৃতির বিলম্বই তরুণ কবির বিকাশে শাপে বর হয়ে দেখা দেয়,—শামসুর রাহমানের আত্মপ্রতিষ্ঠায় এলিয়টের এই বাণী যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্য। পূর্বখণ্ডে দীর্ঘদিন খানিকটা স্বীকৃত, বহুলাংশে অস্বীকৃত, অতৃপ্ত শামসুর রাহমানকে বৃহত্তর স্বীকৃতি কিংবা অন্য কোন কারণেও, কবিতা প্রকাশের, আরও এক আশ্রয় হিসেবে কলকাতা ও কলকাতার পত্র-পত্রিকাকেও বেছে নিতে হয়। এই নির্বাচনের মধ্যেও তাঁর জেদী স্বভাব ও পরিবেশ বিরোধ লক্ষণীয়। দেশ ভাগের অব্যবহিত পরে, প্রায় তাঁর আদি উন্মেষ থেকেই শামসুর রাহমান কলকাতার কয়েকটি নির্ভেজাল সাহিত্য ও কবিতাধর্মী পত্র-পত্রিকার লেখক হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ক্রমান্বয়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পূর্বাশা ও চতুরঙ্গ পত্রিকায়ও প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর কবিতা। কলকাতায় শামসুর রাহমানের প্রকাশ ও স্বীকৃতির একটি ধারাবাহিক ইতিহাসই লক্ষিত হয় যেন বা। কবি-সম্পাদক ছাড়াও, বিদগ্ধজনের কাছে তিনি হয়ে ওঠেন আদৃত। ১৩৬৩ সালে আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতায়' সঙ্কলিত হয় তাঁর দু'টি কবিতা। এই সঙ্কলনে তিনিই ছিলেন পূর্বখণ্ডের একমাত্র প্রতিনিধি। শামসুর রাহমানকে সতেজ ও প্রধান কবিকণ্ঠের স্বীকৃতিদানে আইয়ুবের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ধ্বনি হিল্লোল সন্ধিক্ষণেও দেশ পত্রিকায় শামসুর রাহমানকে নিয়ে মননশীল আলোচনার সূত্র-পাত করেন তিনি। ভাষার অন্যপ্রান্তের প্রধানতম কবির মাধ্যমে যে-খবর পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই ছিল আইয়ুবের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সফল হয়। অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতার লিটল ম্যাগাজিনেও শামসুর রাহমান ছড়িয়ে পড়েন। তাঁকে নিয়ে বিতর্ক ও আলোচনা শুরু হয়। দেশ পত্রিকায় একটি বিতর্কের কথাও মনে

পড়ে। চিঠিতে শামসুর রাহমানকে নিয়ে লড়ে গিয়েছিলেন গোলাম মোরশেদ। স্বাধীনতা সংগ্রামের আবেগ তরঙ্গে, বাংলাদেশের অনেক অ-কবিতা যেমন এখানে বাহবার তুফান তোলে, তেমনি অ-কবিতার ভিড়ে শামসুর রাহমান, শহিদ কাদরী কিংবা আল মাহমুদের মতো স্বচ্ছ দুনিয়ার কবিরাও তর্ক টেবিলের সাময়িকতায় নিন্দিত হয়ে ওঠেন কখনও কখনও। তাঁদের কবি-কর্মের সঙ্গে বিস্তর পরিচয়ের অভাবই ছিল এর কারণ; কিন্তু এই অভাববোধ কমে এলে, অথবা আবেগের তরঙ্গমালা শীতের জলের মতো স্থির হয়ে আসার পরও শামসুর রাহমান এবং তাঁর অন্য দুই সতীর্থের দখল থেকে যায় বিদগ্ধজনের স্মৃতিতে। ১৯৭৭ সালে, চতুরঙ্গ পত্রিকায় শামসুর রাহমানকে নিয়ে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন অমলেন্দু বসু। কলকাতায় শামসুর রাহমানের এই দীর্ঘ স্বীকৃতি দুদিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। এক, বাংলা কবিতায় ভৌগোলিক সীমা অঞ্চলের অশুভ প্রচেষ্টা সজ্ঞানে উড়িয়ে দেওয়া হল; বৃহত্তর বাংলা কবিতার প্রেক্ষাপটে পূর্বখণ্ডের কবিতা বিচার্য হওয়ার সুযোগ পেল। কেবল কবিতা কেন, গোটা সাহিত্যের উপরই দৃষ্টি পড়ল এ অঞ্চলের আত্মতুষ্ট পাঠক ও লেখককুলের। দ্বিতীয়ত, স্বদেশে শামসুর রাহমানের ব্যাপক পরিচিতির সুযোগ ঘটল, প্রশস্ত হল তাঁর স্বচ্ছ মূল্যায়নের রাস্তা। এসব সত্ত্বেও, প্রশস্ততার পরও, কারও কারও বদ্ধ দৃষ্টি নিশ্চল থেকে যায়। এই নিশ্চলতা, যার অন্য নাম ব্যর্থতা—তা বহনের দায়িত্ব একান্তভাবে তাঁদেরই। একটি দেশের তার ভাষার প্রধান কবি ব্যক্তিত্বকে খতিয়ে দেখার জন্যে চোখের ভেতরে যে চোখ থাকা দরকার, দরকার যে নিরপেক্ষ আধুনিকতার, সামন্ত চেতনা বর্জিত বিশুদ্ধতার—তা সমাজ বিশ্লেষণে অর্জিত হলেও, কবিতা আলোচনায় অর্জন করতে পূর্বতন পাকিস্তানের অন্তত দেড় দশক শেষ হয়ে যায়। উল্লেখ করা হয়েছে, কবিতার বিশুদ্ধ আলোচনায় আব্দুল মান্নান সৈয়দই প্রথম কীর্তিমান, অধুনা হুমায়ুন আজাদ; হুমায়ুন, মান্নানের মতোই তীক্ষ্ণ, প্রখর, গম্ভীর। জীবনবোধের নিরপেক্ষ প্রশ্নে তিনি মান্নানের চেয়েও অনেক বেশি আধুনিক। বস্তুত হুমায়ুন আজাদের মতোই একজন বিশুদ্ধ আলোচকের অপেক্ষায় ছিল, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা—অন্য অর্থে শামসুর রাহমানের কবিতা। বস্তুত, হুমায়ুন আজাদই সামগ্রিক, শামসুর রাহমানের প্রথম শিক্ষিত ভাষ্যকার। শুধু ভাষ্যকারই নন, বাংলা কবিতার 'আধার আধেয় ব্যাখ্যার'[৭] এক নিপুণ সাহসী শিল্পী। তাঁর নৈপুণ্যের ত্রিনয়ন গোটা বাংলা কবিতা, বহির্বিশ্ব এবং শামসুর রাহমানের ৩৫ বছরের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ছড়ান। শামসুর রাহমানের অতি আধুনিকতা ও নাগরিক

জটিলতার সার্বিক বিশ্লেষণে তিনিই একমাত্র পারমার্থিক। পূর্বগামীদের ব্যর্থতা ও হুমায়ুনের সাফল্য প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্যই স্মরণযোগ্য, হুমায়ুন ও শামসুর রাহমানের নাগরিকবোধের স্রোত প্রায় একই খাতে প্রবাহিত, একই নাস্তিক্য ও আন্তর্জাতিকতাবোধে দুইজনই সমান উৎসাহী। ফলে পূর্বসূরীর বিশ্লেষণে উত্তর-সূরীও একজন সুদক্ষ স্রষ্টা। পূর্বখণ্ডে, হুমায়ুনের পূর্বগামী, শামসুর রাহমানের সম-সাময়িক, কিংবা তাঁরও পূর্বগামী কবিতা-আলোচকদের কেউই বিঘোষিত নাস্তিক্য ও জটিল নাগরিক মনস্তত্ত্বে অভ্যস্ত নন। তাই শামসুর রাহমানের নাগরিক নাস্তিক্য ও গ্রহণশীলতায় তাঁরা উদ্বুদ্ধ হন না, বিরক্তই হন, তাঁদের পরম্পরাগত ধর্মবোধই হয়ে ওঠে চকিত। শঙ্কিত। এজন্যে শামসুর রাহমানের নাগরিকতা তাঁদের কাছে পরিত্যাজ্য।

বাঙালি মুসলমানের আত্মজিজ্ঞাসার রাস্তা নিষ্কণ্টক নয়, কখনও ছিল না, আজও নেই। পূর্ব প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্বে যুগ যুগ ব্যাপী তার মনীষার অবক্ষয়, তার মস্তিষ্কক্ষরণ ঘটেছে। উনিশ শতকের উর্বর জমিতেও সে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের মতো হয়ে উঠতে পারেনি জিজ্ঞাসু কিংবা সম্প্রদায় চিন্তাচ্যুত। ধর্ম, সংস্কার, ভীরুতা, সংশয়, সন্দেহ ও অতীতমুখী রোমান্টিকতার কঠিন দেয়ালে অহরহ রুদ্ধ হয়েছে তার গতি, বিশ শতকের গোড়াতেও এমন কি সম্ভব হয়ে ওঠেনি তার অনর্গল বিকাশ, না গদ্যে, না পদ্যে,—মননশীল রচনায়। বিশ সালের পর থেকে একমাত্র কাজী নজরুল ইসলামের উদ্দীপনাময় প্রেরণাই প্রথম তার স্থির চিন্তায় ঢেউ তোলে, সেও স্বদেশ ও স্বভাষার প্রধান স্রোতে একাত্ম হতে চায়, হয়ও, নজরুলই প্রথম তার চিন্তাকে সাহিত্যবোধের পরম্পরায় যুক্ত করলেন; এর আগেও বারদুয়েক তার চিন্তায় ধারাবাহিক স্রোত যুক্ত হয়েছিল। একবার মধ্যযুগে, অন্যবার উনিশ শতকে, আঠারশ সত্তর সালের পর মশারফ হোসেনের একক চেষ্টায়। মধ্যযুগীয় প্রচেষ্টা কবরে যায় মধ্যযুগেই। মশারফ হোসেনের সংগ্রামও খতম হয় একাকীত্বে, অবহেলায়, অবজ্ঞায়, সর্বোপরি তাঁর পশ্চাদপসরণে। তবে মীর মশারফ হোসেনের চেষ্টা ব্যর্থ নয় ততটা, না গদ্যের সাফল্যে, না তদনুগ চিন্তার পুনরাবিষ্কারে। আঠারশো সত্তর সালের পর থেকে বিশ শতকের বিশ সাল পর্যন্ত বাঙালি মুসলিম-মানসে ইতস্তত উঁকি দিয়েছে তাঁর সত্তা। তাঁর জিজ্ঞাসা। কাজি নজরুলই এসব ইতস্তত জিজ্ঞাসার প্রথম জঙ্গী প্রকাশ। এখানেই নজরুলের সাফল্য। তাঁর গুরুত্ব কবি হিসেবে নয়, বাঙালির সুস্থ চেতনার এক মহানায়ক হিসেবেই তিনি আমাদের নমস্য। প্রণম্য। মধুসূদন কিংবা রবীন্দ্রনাথ নন,

তিনিই বাঙালির গৃহীত বর্জিত লৌকিক ঐতিহ্যের প্রথম উত্তরাধিকারী। স্বাভাবিক কারণেই, নজরুলের উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হয় মুসলমান মধ্যবিত্ত, বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতার সঙ্গে যুক্ত হয় তার চিন্তা। এখানেই নজরুলের সাফল্য। কিন্তু ব্যর্থতা অন্যত্র। ব্যর্থতার জন্যে তিনি, তাঁর অপব্যয়, অস্থিরতা, বেহিসেবী উৎসাহ ও উচ্চকণ্ঠ যতটা দায়ী—অতীতের অবক্ষয় ও মস্তিষ্কক্ষরণ তার চেয়ে ঢের বেশি নিন্দিত হওয়ার যোগ্য। সামাজিক ক্ষয়রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে নিজেই শেষ পর্যন্ত রোগের শিকার হয়ে গেলেন কবি নজরুল, তার উত্তরণ আর সম্ভব হল না, তিরিশের আধুনিকদের সামান্য পূর্ববর্তী হয়েও, এমন কি কারও কারও আদি উন্মেষের মুরশিদ হওয়া সত্ত্বেও, (জীবনানন্দের) আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত হল না নজরুলের চিন্তা; তিনি থেকে গেলেন দ্বান্দ্বিক, মধ্যযুগীয়, কখনও বা বহির্মুখী; বর্তমানতাও অতি উদ্দীপনার ফাঁকা আওয়াজেই নিঃশেষিত হয়ে গেল তাঁর উচ্চ কণ্ঠ। উচ্চ কণ্ঠ শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করল। সঙ্গীতে, গানে এবং আধুনিকতা-বিরোধী ছায়াবাদে। মুসলিম মধ্যবিত্ত নজরুল ইসলামের কাছ থেকে আত্ম-জাগরণের স্পৃহা অনুভব করল, শুভবুদ্ধি ও আধুনিকতার পথে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা পেল না, পেতে পারত, বিস্তর সুযোগ ও দরজা উন্মুক্ত করেছিলেন নজরুল। খোলা দরজা তাদের চোখে পড়েনি, চোখে পড়ল শুধুমাত্র ফুলিঙ্গ অথবা নজরুলের অগ্নিকুণ্ড। আর এই অগ্নিকুণ্ডের পূজা-আর্চায়, নজরুলের অনুকরণেই নিঃশেষিত হল তার অন্তত তিন দশকের মেধা। সৃজনশীল গদ্য পদ্য সর্বত্রই একই আবর্তে তার পরিক্রমা। ব্যতিক্রম একমাত্র প্রবন্ধ। প্রবন্ধেই সে ভয়ঙ্কর জিজ্ঞাসু। বস্তুত প্রবন্ধেই তার আধুনিকতার প্রথম প্রস্তুতি। কবিতা, কথাসাহিত্য কিংবা নাটকে নয়।

চল্লিশের বাংলা কবিতায় আধুনিকতার পাঁচ মহল যখন সুপ্রতিষ্ঠিত, যখন পাঁচজন অতি আধুনিকের কাঁধে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ সরকার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও নরেশ গুহ প্রমুখ ঋণ বর্জনে, নতুন পথের সন্ধানে প্রায় মরিয়া, তখনও মুসলিম কবিদের নজরুল কিংবা রবীন্দ্র পরিভ্রমণ অব্যাহত। চল্লিশের বহুসংখ্যক মুসলিম কবিই হয় রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণে নইলে নজরুলের অগ্নিকুণ্ডে অহেতুক আত্মাহুতিতে নিরত। তাঁদের গরিষ্ঠ সংখ্যার অনুশীলনই আজ সমাজতত্ত্বের নিছক গবেষণা উপাদানে রূপান্তরিত। চল্লিশের মাত্র চারজন—ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলি আহসান, আবুল হোসেন ও আহসান হাবিবের মধ্যে একসময় আধুনিকতার আদি উন্মেষ

লক্ষণীয় হলেও, তাঁরাও শেষ পর্যন্ত ঘোষিত প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সমর্থ নন। নজরুল ইসলামের উচ্চকণ্ঠের পরিশীলন, পুনরাবৃত্তি ও অতীত আত্মগত্যের অন্ধকারে হারিয়ে গেল ফররুখ আহমদের কবিকণ্ঠ। প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তির ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে প্রায় দেড় দশক কাটিয়ে দিলেন সৈয়দ আলি আহসান। ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর কাব্যকর্মের রূপান্তর ঘটেছে, বিষয়ের চেয়ে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে শব্দ, শব্দকল্প ও বাক প্রতিমা, তবুও তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের আধুনিক উত্তরণ অপ্রই থেকে গেল। আবুল হোসেনও একইভাবে ম্লান। আহসান হবিবের সাফল্য অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল। আহসান হবিব আজও সচল। বিবর্তনবাদী। তবুও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণুদের কাব্যভাষা ও কাব্যবিষয় থেকে আজও তার দূরাবস্থান সম্ভব নয়। গোড়াতেও ছিল না।

এই বিস্তৃত পটভূমি, আত্মবিরোধ আত্মজিজ্ঞাসার রক্তক্ষয়, ব্যর্থতা ও আংশিক সাফল্যকে পিছনে রেখে, কৌশল এড়িয়ে, ছুপায়ে মাড়িয়েই শামসুর রাহমান বাংলা কবিতার জটিল চত্বরে প্রবেশ করেন আটচল্লিশের শেষে[৮]। তাঁর প্রবেশ বা আবির্ভাব হঠাৎ ঘটেনি। তাঁর আবির্ভাবকে অপরিহার্য করে তোলে ইতিহাসের প্রেক্ষাপট। ইতিহাসের পাঠ থেকেই শামসুর রাহমানের কবি-স্বরূপ তাঁর ঐতিহ্য হিসেবে বেছে নেয় রবীন্দ্রনাথ, তিরিশের উত্তরাধিকার এবং বিশ শতকীয় বিশ্ব-বোধকে। এখানেই শামসুর রাহমানের আধুনিকতা কিংবা সামাজিক গুরুত্বের প্রথম সিঁড়ি। এই সিঁড়ি দিয়েই সমকালের বিচিত্র পথে তাঁর ঊর্ধ্বগমন শুরু তিরিশ-চল্লিশের হিন্দু-মুসলিম বিরোধ চর্চার সংক্রামক পরিবেশেই বালক বয়স থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হন তিনি। এই সময়ের পরিবেশ দূষণ এড়িয়ে যাওয়া অবশ্যই কঠিন। কলকাতার সংখ্যাগুরু হিন্দুর কাছে না হলেও পূর্বগণ্ডের মুসলিমের কাছে এটা নিঃসন্দেহে দুর্গম পথ। দুর্গম পথই স্বদেশের ক্রমবর্ধমান জাতীয় জাগরণের মতো হয়ে উঠল তাঁর চেতনার অনুষঙ্গ। অকৃত্রিম সঙ্গী।

গ.

জীবনানন্দের নিঃসঙ্গ জগত থেকেই কাঙ্ক্ষিত সুন্দরের উদ্দেশে শামসুর রাহমানের যাত্রা। তাঁর স্বীকারোক্তি[৯] থেকেই জানা যায়, এম. এ. পড়ার সময় সহপাঠী জিল্লুর রাহমান সিদ্দিকের কাছ থেকে এক রাতের জন্যে ধার করে নিয়ে আসেন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। আচ্ছন্ন হয়ে সারারাত ধরে কাব্যগ্রন্থটি পড়েন। পড়ে শেষ করেন। জীবনানন্দের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। প্রথম পরিচয়েই মুগ্ধ। মুগ্ধতা রূপান্তরিত হয় সহমর্মিতায়, 'এসব কথা আমিও বলতে পারি, আমারও

বলার ছিল, কিন্তু বলে ফেলেছেন একজন জীবনানন্দ'। অনুমান হয়, নিজের গোপন নিঃসঙ্গ পৃথিবীর সঙ্গে জীবনানন্দের আত্মীয়তা অনুভব করে যেমন তিনি তৃপ্ত হন, তেমনি আহতও, কেননা বলার কথা হয়ে গেছে। এরকম এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া থেকেই তিনি নিজের অজ্ঞাতেই প্রবেশ করেন জীবনানন্দে, অথবা জীবনানন্দের প্রবেশ ঘটে তাঁর গোপন আস্তানায়। জীবনানন্দের সঙ্গে প্রথম আলাপের আগেই আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটে যায়। যেমন মোহিতলালের কবিতাও তার পড়া হয়ে যায়। যেমন বুদ্ধদেবের মনোবিশ্বের সঙ্গেও আলাপ ঘটে গেছে, পঞ্চাশ সালের 'নতুন কবিতায়'ও প্রকাশিত হয়ে গেছে তাঁর ছ'টি কবিতা, এই কবিতাগুলিতেও অদ্ভুতভাবে জীবনানন্দের কল্পলোকের সংক্রমণ ঘটে গেছে। পরিচয়ের আগেই কীভাবে এই সংক্রমণ, তাঁর কবি মস্তিষ্কে জীবনানন্দের অনুপ্রবেশ সম্ভব হয়ে উঠল, সেটাই একটি প্রশ্ন। শামসুর রাহমানের স্বীকৃতিতে এই উত্তর নেই। এর উত্তর আছে তাঁর অধ্যয়নের ধারাবাহিকতায়, এর উত্তর আছে দুই কবির চিন্তার সহচরবাদে। এর উত্তর আছে তাঁর ব্যক্তিগত প্রিয় কবি নির্বাচনে। এজন্যেই মোহিতলালের কবিতার প্রসঙ্গ আনা হল, এজন্যে উত্থিত হল বুদ্ধদেবের রোমান্টিক অন্তর্জগতের সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচয়ের অনুষঙ্গ। বলাবাহুল্য, চরাচরে ছড়িয়ে থাকা কালিক প্রভাবের মাধ্যমেও জীবনানন্দীয় নিঃসঙ্গতা বোধের সঙ্গে তাঁর অবচেতন চিন্তার পরিচয় ঘটে গেছে হয়ত বা, ঘটে যাওয়াই স্বাভাবিক। আলাপের পর জীবনানন্দের ভাবানুষঙ্গে তাঁর সন্তরণ আরও গভীর হয়, হয়ে ওঠে প্রচ্ছন্ন, প্রচ্ছন্নতা অনুভূত হয় প্রথম দুই কাব্যগ্রন্থে। অন্যান্য তিরিশের মনো-জগতের আবহাওয়া এই দুই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্জগতে বিস্তারিত। কিন্তু এখানে, এই দুই কাব্য পরিসরে আরও একটি লক্ষণ, অর্থাৎ বহির্গমনের আকাঙ্ক্ষাও হয়ে ওঠে দৃপ্ত। স্পষ্ট হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বোধের গহীন পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা, এই চেষ্টা দীপ্ত হয় শামসুর রাহমানের প্রতিবেশ চেতনা ও সমকাল মগ্নতায়। তিরিশের কবিদের বড় অংশের একচেটিয়া মনোবিশ্বকে অতিক্রম করা, অতিক্রম করার চেষ্টায় নিয়ত হওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না শামসুর রাহমানের। ছিল কি? সাবলম্বী হয়ে ওঠার জন্যে এই চেষ্টা জরুরি ছিল। তাঁর আগে, পূর্বসূরী সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সতর্কতা ও দর্পের সঙ্গেই তিরিশের কবিদের অন্তর্জগতকে অস্বীকার করতে হয়, কেবল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই বা কেন, চল্লিশের প্রধান কবিদের এই পথে পা ফেলতে হয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি বড় সুবিধা হচ্ছে এই, মূলত রাজনৈতিক বিশ্বাসের দৌলতেই সমকাল কণ্টকিত

পথ প্রায় নিষ্কণ্টক হয়ে ওঠে তাঁর কাছে, তাই জলের ভেতরে মাছের সহজ সাঁতারের মতোই সহজ কথাকে, প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা ও বার্তাকে কবিতার শরীর-আত্মায় তিনি জায়গা দিলেন নির্দ্বিধায়। বস্তুত তিরিশের পাঁচ প্রধানের গুরুত্বময় বিস্তৃতিকে সদর্পে, সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যাওয়ার প্রথম কৃতিত্ব সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। সুভাষ মুখোপাধ্যায় পঞ্চাশের উচ্চভাষী কবিদের মনোবিশ্ব ও বহির্বিশ্বের একাত্মীকরণের পথকে সহজ করে দেন চল্লিশে। এই একাত্মীকরণেরই এক প্রধান শিল্পীর নাম শামসুর রাহমান, আরেকটি বেপরোয়া নাম শক্তি চট্টোপাধ্যায়। যাত্রা শুরুতেই নয় শুধু, তাঁর এক দশকের যাত্রাতেও বারবার লাগাম ধরেন জীবনানন্দ। কিন্তু স্বভাব কবিত্ব, অর্ন্তবিশ্ব বহির্বিশ্বের অহরহ সঙ্ঘাত, তাঁর চড়াই উতরাই পথকে জড়িয়ে নেওয়ার অতি উৎসাহ ও সাহস জীবনানন্দের অমিত প্রভাবকে দূরে ঠেলে দেয় ক্রমশ। শক্তি এবং শামসুর রাহমান দুজনেই জীবনানন্দের আমিত্বের নিঃসঙ্গতা ও স্বপ্নময়তায় আক্রান্ত হন অজান্তে। স্বপ্নময়তা ও নিঃসঙ্গতাকে একজন, অর্থাৎ শামসুর রাহমান এড়িয়ে আসেন সজ্ঞানে, কৌশলে গ্রহণ বর্জনের সত্য স্বীকার করে; অন্যদিকে শক্তির মত্ত স্বভাবের দৌরাত্ম্যেই নাজেহাল হয়ে ওঠে জীবনানন্দজাত নিঃসঙ্গ চেতনা। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্বভাবই এমন যে, তাঁর ভেতর বাইরের দ্বন্দ্বেই বর্হিমুখীর সঙ্ঘাত, এই সঙ্ঘাতই তাঁকে ভিন্ন পথে নিয়ে যায়, বাক্‌পটুয়া ও পর্যটকের আসনে বসায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পর্যটনপ্রিয়তাই তাঁকে ক্রমশ জীবনানন্দের জগত থেকে, দূর, দূর প্রান্তিকে সরিয়ে নেয়।

শঙ্খ ঘোষ গোড়া থেকেই বিপরীত মেরুর অধিবাসী। গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথ, কল্লোল যুগ ও উত্তর কল্লোল কবিতার যুক্তস্বনে[১০] তাঁর আগ্রহ। ভাববাদ বা ক্ষণবাদ কোনটাই তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। অতি অর্ন্তমুখীর দুঃখবোধেও তাঁর অনীহা। এসব কারণেই জীবনানন্দের হস্তক্ষেপ ঘটেনি তাঁর রাজ্যে। বরং সতর্কতার সঙ্গেই নিজের সীমান্ত পাহারায় তাঁর দুই চোখ বিনিদ্র। এদিকে অভ্যন্তরেও অক্লান্ত নির্মাণের, সতর্ক সৃষ্টির কৌশল অব্যাহত। এক অর্থে পঞ্চাশের বাংলা কবিতায় নির্জোট আন্দোলনের শরিক যেন বা। বিভিন্নতার মালিক হয়েও তাদের অন্তঃস্রোত বহুলাংশে এক শরীরী। আঁতাতবদ্ধ। শঙ্খ ঘোষই এখনো ব্যতিক্রম। মনন ও নির্মাণে স্বনির্ভরতা ও সংহতি রক্ষায় আজও তিনি একেশ্বর। পাতালবাসী হয়েও তিরিশের মনোপ্রান্তরকে বুড়ো আঙুল দেখাতে পারেন তিনি। প্রতিবেশ ও রাজনীতি সচেতন হয়েও তাঁর মতো উচ্চকণ্ঠের

অবজ্ঞায় এমন পারঙ্গম কে আছে আর? পঞ্চাশের হয়েও পঞ্চাশিদের তছনছ ও ইস্তাহারে গলা মেলাতে দেখা যায়নি তাঁকে। বরং সঙ্গোপনে 'প্রিয় থেকে প্রিয় সখি'[১১] কবিতার সজ্জা নির্মাণে তাঁর দীর্ঘ খাতা আজ তাঁকে এক স্বীকৃত প্রজ্ঞাবান প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করেছে। অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান হয়েও তিনি এক ভয়ঙ্কর প্রতিষ্ঠান বিমুখ! যেন এক তরুণতম জেদী কবি-পুরুষ। শামসুর রাহমানের তিরিশবিরুদ্ধ, বিশেষ করে জীবনানন্দ-বিমুখ নৈর্ব্যক্তিকতা শঙ্খ ঘোষের মতোই অনুচ্চকণ্ঠী। শামসুর রাহমানের পক্ষে উচ্চকণ্ঠী হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কেননা তাঁর রক্তে ছিল পঞ্চাশের তরঙ্গ। দ্বিতীয়ত তাঁর উত্তরণ-মুখর পূর্বগও স্তরে স্তরে— ভাষা, জাতীয় চেতনা, রাজনীতি, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, সামরিক প্রশাসন, প্রশাসন বিরোধ, রবীন্দ্রানুগত্য ও রবীন্দ্র বিরোধিতা, সর্বোপরি গণহত্যা ও মুক্তি-যুদ্ধে কোলাহলময় হয়ে ওঠে। এরকম পরিবেশে কবি স্বভাবের পক্ষে ভীষণ অন্তর্মুখী অথবা বর্হিমুখী হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। আমাদের অভিজ্ঞতা অন্তত তাই বলে। ইতিহাসও তাই বলে। মনস্তত্ত্ব এর সমর্থনে রায় দেয়। কিন্তু শামসুর রাহমান আমাদের অভিজ্ঞতা, ইতিহাস মনোবিজ্ঞানকে প্রায় বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এক অভিনব কৌশল তৈরি করে নেন নিজের পরিমণ্ডলে। এর নামও হয়ত একাত্মীকরণ। এই কৌশলের জরিয়তে বাইরের অভিজ্ঞতা চলে আসে ভেতরে, ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে মিশ্র ক্রিয়ার নির্যাস। বেরিয়ে আসে বাইরে। সমকালে।

বলাবাহুল্য, একক অভিমানের শুরুতেই আচমকা আহরণধর্মী একাত্মীকরণের এই স্বভাব লক্ষণীয় হয়ে ওঠেনি তাঁর মধ্যে, হওয়া সম্ভব নয়, নিজের সংগ্রহশালাকে বর্ণাঢ্য করে তুলতে, প্রাচুর্যে ভরে দিতে তাঁকে প্রায় এক দশক অভিজ্ঞতার সিঁড়ি বেয়ে হামাগুড়ি দিতে হয়েছে এবং 'রৌদ্র করোটি'তে (১৯৬৩) এসেই তিনি তাঁর প্রথম স্বনির্ভর অবস্থানের কথা ঘোষণা করেন। করতে থাকেন সদর্পে। শামসুর রাহমানের উত্তরণের পথে রৌদ্র করোটির প্রকাশ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বা তার চেয়েও বড়, মহৎ অন্য কিছু। কেননা এই কাব্যগ্রন্থে বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবিকে তিরিশের অন্তর্জগতের উত্তরাধিকার এবং প্রতিবেশ-বিশ্বের প্রতি-মুহূর্তের ঘটনা, কোলাহল ও ভাঙচুরের মধ্যে সূক্ষ্ম সম্পর্ক স্থাপনে দেখা গেল সাবিক সফল হতে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'তেও এই প্রয়াস ছিল, কিন্তু ইতঃস্তত; আর সেই প্রয়াসে জটিলতা সৃষ্টি করেন একদিকে জীবনানন্দ, অন্যদিকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সুধীন্দ্রনাথের কাব্য ভাষা আর

জীবনানন্দের অন্তর পৃথিবীর নিহিত হাওয়ার অনুপ্রবেশে দ্বিধান্বিত হয়ে ওঠে কবিকণ্ঠ। রৌদ্র করোটিতে তুজন প্রায় হয়ে ওঠেন প্রতিরোধ্য, এবং 'বিধ্বস্ত নীলিমায়' (১৩৭৩) প্রকাশ্যে ঘোষিত হয় তাঁদের নির্বাসন কিংবা বহিষ্কার। বিধ্বস্ত নীলিমা থেকেই পরিপূর্ণ সমকাল মগ্ন কবির যাত্রা শুরু। তাঁর সমকাল-চেতনা এখানে মগ্নতায় রূপান্তরিত। এখানে কবিতার নায়কের নাম দুর্দশাগ্রস্ত সময়, সময়ের সংঘাত, হতাশা। শামসুর রাহমানের আরও ২১টি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থেও সমকাল ও অন্তর্জগত একইভাবেই সংযুক্তিতে অন্তর্গত। সংযোগের প্রকাশও বিচিত্র। বহুগামী। অভিজ্ঞতা, পুরাণ ও প্রতীকেরা যেমন দেশজ। তেমনি বিদেশী। বিদেশী হলেও তাদের পতিবেশ ও পরিবেশমগ্নতা ও ব্যস্ততা এদেশীয়— আমাদের জ্ঞান, চিন্তা, আবেগ, অনুভূতি, যুক্তি ও বিবেকের সঙ্গে যুক্ত। গভীর ভাবে সম্পৃক্ত। তিনি—শামসুর রাহমান আমাদের আত্মীয়—আমাদের ভাই— বাংলা ও বাঙালির কবি বলেই, আমাদেরই আলো-হাওয়া রোদ্দুরে পানমত্ত একজন ঋত্বিক বলেই, পরদেশী আত্মারাও তাঁর হাতে হয়ে ওঠে দেশীয়। বঙ্গীয়।

উৎস নির্দেশ

১. হুমায়ুন আজাদ। শামসুর রাহমান: নিঃসঙ্গ শেরপা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩

২. ঐ, পৃ ১৯

৩. এক সাক্ষাৎকারে শামসুর রাহমান লেখককে একথা জানিয়েছেন। তিরাশি সালের উনত্রিশে জানুয়ারি কলকাতার পার্ক হোটেলে তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

৪. শামসুর রাহমান: নিঃসঙ্গ শেরপা, পৃ ২১।

৫. সৈয়দ আলি আহসান, আধুনিক বাংলা কবিতা: শব্দের অনুষঙ্গ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ ১১৭।

৬. আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত: পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা ১৩৬৩, পৃ ২১২।

৭. শামসুর রাহমান: নিঃসঙ্গ শেরপা, ভূমিকা।

৮. আবু হাসান শাহরিয়ার ও সৈয়দ আল ফারুক সম্পাদিত, প্রামাণ্য শামসুর রাহমান, আগামীকাল প্রকাশনী, ১৯৮৩ পৃ ৯।

৯. ঐ সাক্ষাৎকার।

১০. শঙ্খ ঘোষের কবিতা, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, কৃত্তিবাস সংকলন—৯ কৃত্তিবাস সংকলন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৩৯১, পৃ ১০১।

১১. শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ ২৩।

[শামসুর রাহমানের ওপর বিস্তৃত আলোচনা পশ্চিমবঙ্গে খুব কমই হয়েছে। তার সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে বর্তমান নিবন্ধের লেখক বাংলাদেশ এবং এপার-বাংলার সমসাময়িক আরো বহু কবি সম্পর্কে আলোচনা ও মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। লেখার বিস্তৃতি সত্ত্বেও মনোযোগী পাঠকের কাছে বিষয়টি আরো দ্বিতীয় মত পোষণ সাপেক্ষ আলোচনার যোগ্য বলে মনে হতে পারে। বলা বাহুল্য আমরাও লেখকের প্রতিটি মতের অনুসারী নই। এ বিষয়ে আরো বিস্তৃত যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনার সূত্রপাত হলে আমরা খুশীই হব। —সম্পাদক]

শামসুর রাহমানের চারটি কবিতা

শব্দের মৃগতৃষ্ণা

'মেয়েরা উঠলে ছাদে অতি দ্রুত সূর্য ডুবে যায়,
চাঁদ ওঠে
ওদের স্তনের মতো সাবলীলভাবে'—
এটুকু লিখেই থামলেন তিনি। বাক্যটি লেখা হয়ে
যাবার পর শব্দ সমুদয় থেকে অনেকদিন
তোরঙ্গে-রাখা কাপড় চোপড়ের
ভাঁজখোলাকালীন যে গন্ধ বিস্ফারিত হয়,
সেরকম গন্ধ নাকে লাগলো তাঁর।

প্রতিটি শব্দ শুঁকলেন তিনি
অপরাধী—অনুসন্ধানকারী
কুকুরের মতো, শুঁকলেন বারংবার; বিরক্তি
বোলতা হয়ে ঘুরতে থাকে
নাকের ডগায়, ঘন ভুরুতে। তিন পংক্তি সম্বলিত
কাগজটা দলা পাকিয়ে,
কাঁচাপাকা চুলঅলা মাথাটা ঝাঁকিয়ে, প্রৌঢ় কবি

ফেলে দিলেন বাজে কাগজের ঝুড়িতে, যেমন
ভোরবেলা নাশতা খাবার সময়
মাঝে-মধ্যে পাউরুটির শক্ত অংশগুলি
ছুঁড়ে দেন চড়ুই কিংবা কবুতরের প্রতি।

কবুতরের চোখের রঙের মতো দেয়ালের দিকে তাকিয়ে
কবি খুঁজতে শুরু করলেন
সেসব শব্দের গাছা আর দ্রোহী স্তন,
যারা দপ্‌দপ্‌ করবে তাঁর কপালের রগে,
ঠোঁটে। শব্দের মৃগতৃষা তাঁকে
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্লান্ত করলো; কলমের খাপ
এক হাতে আর অন্য হাতে কলম নিয়ে
বসে থাকতে হলো তাঁকে
ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাঁর অধিকারে এলো না
সেই কাঙ্ক্ষিত জমি,
যার ওপর দিয়ে রাজেন্দ্রানীর মতো হেঁটে যাবে
সৌন্দর্য।

গায়ে পাঞ্জাবি চাপিয়ে
তিনি বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়, বিন্দুমাত্র
আমলে আনলেন না গ্রীষ্মের চড়া রোদ,
ঘুরলেন অলিতে গলিতে,
ঘামে ভিজে উঠলো পাঞ্জাবি, গেঞ্জি আর
আণ্ডারওয়ার; অথচ ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর।
দুপুরে চাইনীজ রেস্তোরাঁয় কাটলো কিছুক্ষণ,
বিকেলে বন্ধুর ডেরায় আর
প্রচুর মদ খেয়ে যখন বাসার কড়া নাড়লেন,
তখন মধ্যরাত নিজেই টঙ হয়ে আছে
গাঁজা-খাওয়া সন্ন্যাসীর মতো।

বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন কবি,
চশ্মল খসে পড়লো পা থেকে এবং তিনি
দেখতে পেলেন
টেবিলে-রাখা গোলাপটিকে, যার রঙ এখন
খাসির কলজের মতো।
ঢুলু ঢুলু চোখে তিনি দেখলেন একটা বুনো ঘোড়া ওর তরঙ্গিত
কেশর দিয়ে আদর করছে পূর্ণিমা চাঁদকে,
যেন সে চাঁদ আর আকাশের
ভারসাম্য রক্ষার জন্যে বড় যত্নপরায়ণ। পর্বতপ্রমাণ
তুষারস্তূপে রবীন্দ্রনাথের মুখ
আবিষ্কার ক'রে গুনগুনিয়ে
ওঠেন তিনি, তারপর ঘুম ওঁকে মুকুট পরিয়ে
নিয়ে যায় নক্ষত্র সভায়।

ভোর জাগিয়ে তোলে কবিকে, যেন
এক্ষুনি ঘটবে কবিতার উন্মোচন, ধড়ফড়িয়ে উঠে
তিনি বসলেন লেখার টেবিলে,
কিন্তু চতুর্দিকে ব্যেপে এলো এমন এক স্তব্ধতা
যার পবিত্রতা হরণ করার জন্যে সেই মুহূর্তে
কোনো আগ্রহের দীপ আর জ্বলে উঠলো না
তাঁর হৃদয়ে।

কেউ কেউ থাকে

কেউ কেউ থাকে, যার ঈগলের মতো
দীপ্তি থাকে, অথচ সে বিভা
ঝলসে ওঠে না
প্রকাশ্যে কখনো, সে কেবলি
নিজের অন্তরে

একটি গোপন দাহ নিয়ে বাঁচে, সেঁচে
নিজস্ব দুঃখের খাল একা
বসে থাকে বড় চুপচাপ লোকচক্ষুর আড়ালে।

কেউ কেউ থাকে, যে প্রত্যহ স্বপ্ন দেখে
জেগে ওঠে ভোরবেলা, কিন্তু স্বপ্ন তার সর্বদাই
পরাবাস্তবের
প্রান্তরে মিলিয়ে যায়। ঝাঁক ঝাঁক কাক
অকস্মাৎ ঢুকে পড়ে তার
মাথার ভেতরে,
কোকিল পরাস্ত হয়ে উড়ে যায় দূরে বহু দূরে,
জ্যোৎস্না হাহাকার করে ভায়োলিন-সুরে।

কেউ কেউ থাকে, যার পায়ে
জমে ধুলো রাশি রাশি, অথচ সে তীর্থে কোনোদিন
পৌঁছুতে পারে না, প'ড়ে থাকে
বেগানা পথের ধারে, মৃগতৃষাময়
চোখ জ্বালা করে তার সকল সময়। ফিরে আসে
আপন ডেরায় কোনোদিন,
যদি ইচ্ছে হয়; ফের সিঁড়ি বেয়ে ওঠে নামে, হঠাৎ কখনো
তার সঙ্গে দুঃস্বপ্নের জটলায় দেখা হয়ে যায়।

কষ্ট

রাত্রিবেলা শুনি আর্ত গলার আওয়াজ—
'আমার কষ্টে তোমার কী গো ?'
ঘোর নিশীথে রোগীর কষ্ট বাড়ার মতো
রাত বেড়ে যায়,
রাত বেড়ে যায় ক্রমাগত, বুকের ভেতর
কষ্ট বাড়ে। কিন্তু তুমি ব্যথাজাগর কণ্ঠ থেকে
ঝরিয়ে দিলে শব্দ কিছু—
'আমার কষ্টে তোমার কী গো ?'

কাঙাল আমি, হাত বাড়িয়ে থাকি সদাই ;
তোমার দেখার আশায় আজো
সকল সময় চক্ষু দুটি মেলে রাখি
রৌদ্র ছায়ায়, জ্যোৎস্নাপুরে।
কোথাও আমি হাত দেখিনা, মানে তোমার
হাত দেখিনা।
কাঙাল আমি, হাত বাড়িয়ে থাকি সদাই।

হস্তমাথা নেই কি তোমার ? তবে বলো
কেমন ক'রে অমন সুরে কথা ছড়াও
রাতের বুকে ?
অন্ধকারে শুনেছিলাম, 'আমার খোঁজে বৃথাই ঘোরো,
একটুখানি সবুর করো, সময় হ'লে
নিজেই আমি নেবো খুঁজে। একলা থাকা
ভালো আমার,
তাইতো এমন একলা থাকি।'

যখন বলি, 'এমন একা একা থাকা কষ্ট ভীষণ,'
তখন আর্ত কণ্ঠ বাজে মাঝ নিশীথে—
'আমার কষ্টে তোমার কী গো ?'

আমি এক ভদ্রলোক

আমি এক ভদ্রলোককে রোজ
দেখি। তিনি কখনো বসে থাকেন চুপচাপ
কাঠের চেয়ারে হেলান দিয়ে, কখনো বারান্দায়
দাঁড়িয়ে কয়েকটি জালালী কবুতরের
আসা-যাওয়া দেখেন,
কখনো বা থাকেন ঘুমিয়ে।

এই যে ভদ্রলোককে দেখি, দেখে আসছি
দীর্ঘকাল থেকে, এর মধ্যে, সত্যি বলতে কি,
কোনো ঝলমলে
চমৎকারিত্ব নেই। যদি তাকে না দেখতাম
তাহলে
ক্ষতির বান ডাকতো বলে মনে হয় না।

ভদ্রলোক কী করেন
কেমন করে তার সংসার চলে কিংবা
আদৌ তার কোনো সংসার আছে কিনা, এ বিষয়ে
আজ অব্দি আমি কোনো চড়ুই-চঞ্চল
ঔৎসুক্য দেখাইনি। তবে এই ভদ্রলোকটিকে নিয়ে
আমি যে একেবারেই
মাথা ঘামাইনি, এমন নয়। এমনও হয়েছে
ভদ্রলোকের কথা ভাবতে গিয়ে
তার মুখের রেখাগুলিকে আমি হারিয়ে ফেলেছি।

আর যে কথাটা বলতে গিয়েও
এখনো বলা হয়নি তার সারাংসার হলো
ভদ্রলোককে দেখলে
আমার ভারি ভয় হয়। তিনি যখন হাওয়ার দিকে
মুখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকেন, অথবা
হাতে তুলে নেন রক্তজবা, তখন আমি ভয় পাই।

কেন এই ভয়, এই প্রশ্নের
কোনো সদুত্তর আমার জানা নেই।

তাকে আমি কোনোদিন কোনো মহফিলে,
গানের জলসায় দেখিনি। কখনো
সানাই-গুঞ্জরিত বিবাহ মণ্ডপে কিংবা
কোনো শবানুগমনে তিনি সামিল হয়েছেন বলে মনে পড়ে না।

একদিন চোখে পড়লো,
রোজ যেখানে
ভদ্রলোককে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতাম,
সেই নির্দিষ্ট জায়গাটা ভীষণ সাদাটা এবং
ধৃতরাষ্ট্র শূন্যতা আমাকে আলিঙ্গন করে।

এতদিন ভাবতাম, সেখানে সেই ভদ্রলোককে
দেখতে না পেলেই
আমার ভয় কেটে যাবে। অথচ এখন
কাকতাড়ুয়ার মতো ভয় আরো বেশি ভয়
দেখাতে শুরু করলো আমাকে, আমার নিজেরই জন্যে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

পুলিনবিহারী সেন

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

এ সংসারে কোনো কোনো মানুষ আছেন যাঁদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য যখন আমাদের অনায়াসলভ্য থাকে তখন আমরা তাঁদের প্রতি যথার্থ আগ্রহ প্রকাশ করতে বা তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে কৃপণতা করি। কিন্তু এঁরা আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের অন্তরালে চলে গেলে হঠাৎ এক বিষণ্ণ উপলব্ধি জাগে যে এমন অনেক কিছু আমাদের অজানা রয়ে গেল যা হয়তো আর কোনোদিনই আমাদের গোচরে আসবে না, অনেক কিছু থেকে আমরা আমাদের সম্মুখবর্তী বাকি জীবনে নিশ্চিতভাবে বঞ্চিত রয়ে গেলাম। গত ১৪ অক্টোবর পুলিনবিহারী সেনের মৃত্যুতে সেই অতর্কিত অনুভূতিটিই প্রবলভাবে মনকে আচ্ছন্ন করেছে।

পরিচিত জনের এক সুপরিব্যাপ্ত বৃত্তে আত্যন্তিক শ্লাঘনীয় নাম হলেও, পুলিনবিহারী সেন, বর্তমান বাজারে যাকে খ্যাতিমান বলে তা ছিলেন না। বরং প্রচলিত খ্যাতি সম্বন্ধে তাঁর কিঞ্চিৎ ভীতিই ছিল। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে নিমন্ত্রণ এলে বন্ধুবর্গ ও হিতৈষীজনের সস্নেহ তাড়নায় সে নিমন্ত্রণ রক্ষায় উদ্‌যোগী হলেও, যেই উপলব্ধি করলেন যে প্রবাসে বিদেশী পোষাকে সংবর্ধনা সভায় বা টেলিভিশনে ভাষণ দিয়ে দেশের মান ও নিজের নাম রক্ষা করতে হতে পারে, অমনি ত্রস্ত চিত্তে বিমর্ষ বদনে তাঁর অনতি-পরিসর শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, বিদেশযাত্রার উপকরণ হিসেবে সদ্যক্রীত জুতোজোড়া কোনো প্রীতিভাজনকে অচিরে উপহার দিয়ে যেন এক দুঃস্বপ্নের গ্লানি থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। এই এবং এরকম আরও অনেক ঘটনা থেকে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে পুলিনবিহারী সেন শুধু যে খ্যাতিমান ছিলেন না তা নয় খ্যাতিপিপাসুও ছিলেন না। আমাদের জীবনে খ্যাতিপিপাসার সূত্রে একটা মাত্রাতিরিক্ত ভারসাম্যহীনতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। পুলিনবিহারী সে ব্যাপারেও যে যথাবিহিত সচেতন ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সম্পাদিত রবীন্দ্রগ্রন্থগুলিতে। রবীন্দ্রনাথের বইয়ে পাছে পুলিনবিহারী সেনের নাম অযথা প্রচার লাভ করে বা রবীন্দ্র রচনা সম্পাদনার ধৃষ্টতা প্রকট হয়ে পড়ে সেই সংকোচে নিজেকে কখনো সম্পাদক হিসেবে জাহির করতে চান নি, সবিনয়ে 'সংকলয়িতা' বলে নিজেকে অভিহিত করেছেন। এবং প্রখর দৃষ্টি রেখেছেন যাতে তাঁর নাম যথেষ্ট অনুচ্চকিত ক্ষুদ্র অক্ষরে এবং বইয়ের অপেক্ষা-কৃত অন্তরাল অংশে মুদ্রিত হয়। সেখানেও ভয় পাছে নিজের নাম রবীন্দ্রনাথকে ছাপিয়ে প্রচার লাভ করে। বস্তুত, যাঁরা পুলিনবিহারীর কাজের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানেন, তিনি ছাপার কাজে যতদূর সাধ্য মোটা হরপ পরিহার করতেন। পুলিনবিহারী-প্রবর্তিত এই মুদ্রণ-ধারা বাংলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে এক অচিংকৃত মৃদু সৌন্দর্যের পরিবেশ সৃষ্টি করতে নিরন্তর প্রয়াসমান। মুদ্রণে মোটা হরপের সযত্ন পরিহার একান্তই পুলিনবিহারীর মৃদু সংযত সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক মাত্র নয়, তাঁর চরিত্রে যে প্রচারবিরূপতা ছিল, যাকে বস্তুত খ্যাতিপিপাসার প্রতি অকৃত্রিম অনীহা বলা সংগত, তারই দ্যোতনা।

এই আত্মপ্রচার-বিলোপ প্রবণতা তাঁর বাচন ভঙ্গি বা রচনায়ও স্পষ্ট। তিনি পারতপক্ষে 'এ বইখানি পড়েছি' বলতেন না, বলতেন, 'বইখানি দেখেছি' —পাছে বইটির পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠজনিত পণ্ডিতম্মন্যতার প্রচার ঘটে যায়। রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত কোনো তথ্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে সংকোচজড়িত কণ্ঠে বলতেন, 'দেখে বলতে হবে' অথবা অনুচ্চকণ্ঠে জবাব শুরু করতেন, 'যতদূর মনে হয়' বা 'বোধহয়' দিয়ে। এখানেও দ্বিধাবিজড়িত ন্যূনবিবৃতির কারণ আত্যন্তিক স্মৃতিনির্ভরতার কারণে পাছে তথ্যভ্রান্তির অবকাশ প্রশ্রয় পায়। লিখিত গদ্যেও দেখা যায় উত্তমপুরুষদ্যোতক ক্রিয়াপদের অতি কৃপণ উল্লেখ—যেমন 'উল্লেখ করেছি'র পরিবর্তে 'উল্লেখ করা হয়েছে'। পুলিনবিহারীর বাচনে ও ব্যবহারে 'অহম্' পদটি বোধহয় একটু মাত্রাতিরিক্তভাবে বিবর্জিত ছিল। এবং সেই আত্মবিলোপ ব্যাকুলতার মধ্যেই যেন পুলিনবিহারীর যথার্থ অহম্-কার।

তাঁর একান্ত পরিচিত মণ্ডলীর বহির্বৃত্তে পুলিনবিহারীর ব্যক্তিচারিত্র বিষয়ে

স্বাভাবিক অজ্ঞতানিরসন মানসেই যে এসব কথা সবিস্তারে বলতে হচ্ছে তা নয়, পুলিনবিহারীর গবেষণাধারার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিচারিত্রের ছিল এক ঘননিবদ্ধ যোগ। ব্যক্তিজীবনের প্রচারবিমুখতা তাঁকে গবেষণাকার্যে ব্যক্তিনিরপেক্ষ অনেকদেশদর্শী বা অবজেকটিভ হতে সাহায্য করেছিল। এই অবজেকটিভিটিই ছিল পুলিনবিহারীর রবীন্দ্রচর্চার অনন্য বৈশিষ্ট্য। অবজেকটিভিটি একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ মাত্র নয়, তার পিছনে এক অনলস শ্রমজাত তথ্যভিত্তি অপরিহার্য। বস্তুত আমাদের খণ্ড জ্ঞান বা তথ্যানভিজ্ঞতাই আমাদের একদেশ-দর্শী বা সাবজেকটিভ করে তোলে। যেটুকু আমাদের জানার বাইরে থাকে সেটুকু আপন মনের মাধুরী দিয়ে ভরিয়ে বা সাজিয়ে তোলার এক সহজ প্রবণতা আমাদের আচ্ছন্ন করে। পুলিনবিহারীকে অবজেকটিভ থাকতে তাই নিরন্তর পরিশ্রমে সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে তথ্যবৃত্তকে সমৃদ্ধ করতে প্রয়াস করতে হয়েছে। এমনও হয়েছে যে একটিমাত্র পাদটীকাকে সম্পূর্ণতা দিতে সংশয়াতীত প্রমাণের প্রয়োজনে কোনো আপাতঅকিঞ্চিৎকর অথচ অপরিহার্য তথ্য সংকলনের অপেক্ষায় বৎসরাধিক কাল বিগত হওয়ায় গ্রন্থ প্রকাশ বিলম্বিত হয়েছে এবং সে কারণে সহ্যসীমা-অতিক্রান্ত প্রকাশক অসহায়-বোধে পুলিনবিহারীকে গঞ্জনাও দিয়েছেন। কিন্তু প্রকাশকের সনির্বন্ধ তাড়না পুলিনবিহারীকে সংকল্পচ্যুত করতে বা আপোষ করতে বাধ্য করেছে এমন দৃষ্টান্ত নেই। পুলিনবিহারীর বহু আরব্ধ কাজ যে সম্পূর্ণতালাভ করে নি, তার প্রাথমিক কারণ সংশয়াতীত প্রমাণের প্রয়োজনে তথ্য সংকলনে অনিবার্য বিলম্ব।

যদিও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর পরম অন্বিষ্ট, এবং একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ছিল তাঁর বিস্ময়কর আনুগত্য। তথাপি ভক্তিজনিত ভাবাচ্ছন্ন কখনো তাঁর তথ্যনিকষজাত সিদ্ধান্ত থেকে তাঁকে নিরস্ত করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের যে গর্ব রবীন্দ্রচর্চাকে নিয়ে সে গর্ব করতে পারি কিনা সন্দেহ। তার একটা বড়ো কারণ আমাদের রবীন্দ্রচর্চার এক বৃহৎ অংশ রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভক্তিজনিত ভাবাবেগে পিচ্ছিল। সে পথে সত্যে পৌঁছানো অসাধ্য। আর অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্ররচনাকে বিচার। এজাতীয় রবীন্দ্রচর্চার উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় যে রবীন্দ্রসৃষ্টির নির্ভুল সামগ্রিক তথ্য সংকলন ভিন্ন কোনো রবীন্দ্রচর্চাই সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না। ইতিহাসচেতনাবিযুক্ত এবং বৈজ্ঞানিকপদ্ধতিদুর্ভেদ্য এই দেশে যেখানে তথ্য প্রমাণাদি নিত্যঅপস্রিয়মাণ,

সেখানে রবীন্দ্র সমসাময়িক বা অব্যবহিত কালের মানুষের পক্ষে সবচেয়ে জরুরি রবীন্দ্রচর্চা হল রবীন্দ্র রচনার সঠিক পাঠ নির্ণয় উদ্দেশ্যে পাঠবিবর্তনের সামূহিক বিবরণ সংকলন, রবীন্দ্রসৃষ্টিসংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য চয়ন এবং যে দেশ-কালের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব তার যথার্থ পরিচয় বিশ্লেষণ। এই আশু রবীন্দ্রচর্চার প্রতি অমনোযোগ ইতিহাসের কাছে আমাদের লজ্জার কারণ ঘটাতে পারে। পুলিনবিহারী সেই লজ্জার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে নিত্যপ্রয়াসী ছিলেন। এবং সে কারণেই 'সোনার তরী' কবিতার দার্শনিক ব্যাখ্যার চেয়ে রবীন্দ্ররচনা সংবলিত কোনো দুষ্প্রাপ্য সাময়িক পত্রের একটি সংখ্যা বা রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংশোধিত কোনো নাটকের স্টেজ কপি তাঁর কাছে অনেক জরুরি মনে হয়েছিল। তথ্য সংকলনে তাঁর বিস্ময়কর আগ্রহ অনেক সময় বন্ধুমণ্ডলীতে পরিহাসের অবকাশ ঘটিয়েছে। আপন নয়নে কোনো তথ্যের উৎস অর্থাৎ মূল দলিল অবলোকন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত যাচাইয়ের নিষ্ঠা থেকে তিনি কোনো কারণেই নিরস্ত হন নি।

আহরণে নিশ্ছিদ্র প্রয়াস এবং পরিবেশনায় সংযত নিপুণতা উভয়বিধ দক্ষতায় পুলিনবিহারী ছিলেন সব্যসাচী। কিন্তু সে ভূমিকা তিনি পালন করেছেন সাধারণের দৃষ্টির অন্তরাল থেকে। তাই সকল গবেষকের পরম আশ্রয় হয়েও পুলিনবিহারী সেন জীবৎকালে তাঁর যথাযোগ্য সম্মান পেয়ে যান নি, ভাবীকালে যে রবীন্দ্রচর্চা অব্যাহত থাকবে তারই সূত্রে মহাকাল আমাদের সেই অকর্তব্য নিরসন করে তাঁকে তাঁর যথাযোগ্য আসনে বরণ করবেন—এ প্রত্যয় আমাদের আছে।

আলোচনা

সত্যজিৎ রায়ের গল্প

পিনাকী ভাদুড়ী

সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্র ছাড়া ফেলুদা এবং শঙ্কুর জন্যও বিখ্যাত। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর আগমন খানিকটা প্রয়োজনের তাগিদে ঘটেছিল। তাঁর নিজের কথায়, সন্দেশ পত্রিকাকে feed করার জন্যই তিনি লিখতে শুরু করেন। এখন লেখার সংখ্যা তাঁর ফিল্মের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

আমরা এখানে তাঁর সাহিত্যরচনার কথা বলতে গিয়ে ফেলুদা এবং শঙ্কু-রচনাকে বাদ দিচ্ছি। এগুলি নিঃসন্দেহে অধিক জনপ্রিয়। কিন্তু তাঁর অন্যান্য যে সব গল্প আছে, তাদের প্রকৃতিও যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। বাংলাদেশের ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে এই গল্পগুলো নতুনত্ব নিয়ে এসেছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে, পরিকল্পনার দিক থেকে, রচনারীতির দিক থেকে এদের মধ্যে অভিনবত্ব আছে।

পর পর তিনটি বই বেরিয়েছে সত্যজিৎ রায়ের—বারোটি করে গল্প। অর্থাৎ তিন ডজন গল্প। প্রতিটি গল্প নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ নেই, অথবা তার প্রয়োজনও নেই—কয়েকটির কথাই বলব। এসব গল্প ছোটদের জন্য লেখা হলেও এদের আবেদন বড়দের কাছেও সমান মাত্রাতেই উপস্থিত। আসলে এসব গল্পের আবেদন আমাদের বুদ্ধির কাছে। ছোট বলতে একদম ছোট্ট যারা তারা নয়, যারা একটু বড় হয়ে উঠছে, অর্থাৎ বুদ্ধিমান কিশোর যারা, তারা উৎসুক বয়স্কদের সঙ্গে এসব রচনার স্বাদ উপভোগ করতে পারে।

আগেই বলেছি সত্যজিৎ রায়ের গল্পের বিষয়বস্তুর ধরণ অনেকটা বিচিত্র।

গল্পগুলোর কথা মনে করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক্ তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প—'সেপ্টোপাসের খিদে'। গল্পটা একটি মাংসাশী গাছকে নিয়ে। খুব সাদামাটাভাবে গল্পটি শুরু হয়েছে—একটু একটু করে তৈরি হয়েছে ক্লাইম্যাক্স। শেষ পর্যন্ত ঐ গাছের কবল থেকে রক্ষা পেতে গুলীও চালাতে হয়েছে। ষোল পৃষ্ঠার এই গল্পটি ভারী অদ্ভুতভাবে শ্বাসরোধী হয়ে ওঠে—গুলী চালানো পর্যন্ত টানটান হয়ে থাকে উত্তেজনা।

এর পরের গল্প 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু'—সম্পূর্ণ আলাদা জাতের লেখা। পৃথিবীর বাইরে কেনিয়াস গ্রহ থেকে যে প্রাণীটি এসে নামল বঙ্কুবাবুর সামনে, সে শুধু বঙ্কুবাবুকেই চমৎকৃত করেছে এমন নয়, পাঠকদের ভরিয়ে দিয়েছে কৌতুকে। বহিরাগত প্রাণীটি চলিত ধারণা অনুযায়ী পৃথিবীতে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি, কেবল তার মানসিক শক্তির লীলাটুকু দেখিয়েছে। ঘটনাটিতে কোন ভয়াবহতা আনা হয়নি, শুধুমাত্র মজার ধরণে একটি বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

'বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম' গল্পটিতে আছে অন্য ধরণের মজা। একজনের ওপরে কেমন করে স্মৃতিভ্রমের ধারণা চাপিয়ে দেওয়া যায়, নিজের স্মরণশক্তির ওপরে বিশ্বাস হারিয়ে কেমন হয়ে যায় একজন অন্যথায় দৃঢ়মনা ব্যক্তি, এইটি খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে গল্পটিতে।

'অনাথবাবুর ভয়' গল্পটিতে সবসময়েই আছে শিহরণের প্রত্যাশা। ভূত খুঁজতে বেরিয়েছেন অনাথবাবু—শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভয় পেয়ে মরতে হয়েছে, কিন্তু মরার পরে অনাথবাবুর ভূত ভারি প্রসন্ন।

'পটলবাবু ফিল্মস্টার' গল্পে বলবার মতো কিছুই ঘটেনি, কিন্তু মুন্সীয়ানার সঙ্গে একটি মানুষকে প্রকাশ করা হয়েছে। এককালে পটলবাবু অভিনয় করতেন, বাহান্ন বছর বয়সে হঠাৎ ফিল্মে ডাক পেলেন। খুবই উৎসাহ নিয়ে গেলেন তিনি—খুব পাংচুয়ালি পৌঁছলেন স্যুটিংয়ে। কাজকর্ম শুরু হল, তখনো তাঁর সীনটা হয়নি, তিনি ব্যস্ত হচ্ছেন অথচ তাঁর সংলাপ কি তিনি জানতে পাচ্ছেন না। অনেক বলার পরে পেলেন তাঁর ডায়ালগ—একটি মাত্র শব্দ, 'আঃ'। প্রথমে পটলবাবুর মনে হল তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা হচ্ছে, মনে হল যে চলে যান, কিন্তু পরে মনে হতে লাগল যে ঐ একটি শব্দ কতরকম ভাবে বলা যায়। এক এক রকম অনুভূতি হলে এক এক ভাবে শব্দটা উচ্চারণ করা যায়। শেষ পর্যন্ত 'দশ আনা বিরক্তি, তিন আনা বিস্ময়, তিন আনা যন্ত্রণা' মিশিয়ে তিনি পার্টটা বলে এলেন। টাকার জন্য দাঁড়ালেন না। নিখুঁত কাজের আগ্রহ

আর পরিশ্রমের রূপটা এই গল্পে, আশ্চর্য ফোটানো হয়েছে।

'নীল আতংক' গল্পের পটভূমি নীল চাষের সময়। সেই সময়কার একটি বাংলোয় উপস্থিত হয় গল্পের নায়ক। কিন্তু না, সে কোন নীলকরের প্রেতকে সেখানে দেখতে পায় না—বরং সে নিজেই পরিবর্তিত হয় এক নীলকর সাহেবের শরীরে। তার চেহারা বদলায়, তার কণ্ঠস্বর বদলায়, তার স্বভাব বদলায়। একটি শতবর্ষ পুরোনো ঘটনার সে পুনরভিনয় করে। গল্পের বিশেষত্ব নেই, বিশেষত্ব আছে আঙ্গিক পরিকল্পনায়।

সত্যজিৎ রায়ের গল্পে, বোঝাই যাচ্ছে, বৈচিত্র্যের অভাব নেই। তাঁর চলচ্চিত্রের মতোই, এ ধরণের গল্পরচনায়, তিনি নিজের পুনরাবৃত্তি করেন না। নানারকম বিষয় নিয়ে লেখেন—মজার ভূতের, কল্পবিজ্ঞান,—বিষয়ের অন্ত নেই। চরিত্রগুলো ফুটে ওঠে দুচারটি সংলাপে বা ছবির মতো দুএকটি বর্ণনার টানে। ভাষার ভঙ্গিও খুব মাপসই হয়।

'বৃহচ্চঞ্চু' গল্পে তুলসীবাবু একটি পাখি পুষে ঐ নামটি রেখেছিলেন। মাংস খেত পাখিটি। দ্রুত বড় হয়ে উঠল সে আর নির্মম হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। পাখিটিকে দূরদেশে ফেলে দিয়ে এলেন তুলসীবাবু। নিজে চক্রপর্ণের রস খেয়ে রক্তের চাপ কমালেন, সেই সঙ্গে মাংসে রুচি চলে গেল। ওদিকে ঐ বৃহচ্চঞ্চু সেই জঙ্গলে প্রাণীহত্যা করে বেড়াতে লাগল। এক শিকারীকেও ভক্ষণ করে ফেলল সে। তুলসীবাবু হাজির হলেন সেখানে, বৃহচ্চঞ্চুকে খেতে দিলেন চক্রপর্ণের রস মাখানো মাংস। বলে এলেন, 'অনেক লজ্জা দিয়েছিস আমাকে, আর দিসনি'। পাখি তার কথা রেখেছিল।

'খগম' গল্পটি বিস্ময়কর। একটি অলৌকিক অতিপ্রাকৃত ছমছমে ভাব আছে। ধূর্জটিবাবু ইমলিবাবার পোষা সাপকে গুলী করে মারলেন। আর তারপরে বাবার অভিশাপে তাঁকেও সাপ হয়ে যেতে হল। সাপ হবার আগে তিনি একটা অবান্তর প্রশ্ন করেছিলেন, 'খগম কে বলুনতো মশাই?' খগম এক তপস্বী, যাঁর শাপে এক মুনিকে সাপ হতে হয়েছিল। আশ্চর্য রহস্যময়তা এবং আশ্চর্য এক শিরশিরানি গল্পটির সর্বাঙ্গে বিস্তৃত। যতক্ষণ পড়া যায়, ততক্ষণই এক নিদারুণ ভয় ভয় অস্বস্তি চেপে ধরে পাঠককে।

'ব্রাউনসাহেবের বাড়ি' গল্পটি একটি ভৌতিক পরিমণ্ডলে রচিত। পুরোনো একটি ডায়েরী পড়ে জানা যায় যে ব্রাউনসাহেব তাঁর অতিপ্রিয়

সাইমনকে মৃত্যুর পরেও দেখতে পেতেন। তিন উৎসাহী ব্যক্তি সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হল যদি তারাও সাইমনের প্রেতকে দেখতে পায়। অধীর প্রতীক্ষাতেও কিছুই দেখা যাচ্ছে না, একটা কালো বেড়াল ছাড়া। গল্পের শেষে জানা গেল ঐ বেড়ালটাই সেই সাইমন—সো সাইমন ওয়াজ এ ক্যাট—পড়তে পড়তে মেরুদণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

'ভূতো' গল্পটির পেছনে লেখকের প্রস্তুতির একটি ইতিহাস পাঠকের সামনে প্রকাশিত হয়। গল্পটি ভেণ্ট্রোলোকুইজম নিয়ে। কেমন করে এই বিদ্যাটি শিখতে হয়, কেমন করে তাকে কাজে লাগানো হয়ে থাকে, সেইটি অতি সহজেই এই গল্পের মধ্যে আমরা জানতে পারি। অথচ জানাবার কাজটি চলে অলক্ষ্যে, আসলে এর মধ্যে দুই ভেণ্ট্রোলোকুইস্টের দ্বন্দ্বের যে কাহিনী বিবৃত তা মানবিক ঈর্ষার রঙে রঞ্জিত, আবার তার মধ্যে সত্যজিতের স্টাইলে অপ্রাকৃত রসও বিদ্যমান। এই সঙ্গেই ভেণ্ট্রোলোকুইজমের মূল ব্যাপারটা আমরা জেনে যাই। যেমন প বর্গের কোন বর্ণ উচ্চারণ করতে গেলে ধরা পড়ে যেতে হতে পারে কারণ তাতে ঠোঁটে ঠোঁটে ঠেকে যায়—সেজন্য ওগুলো কৌশলে বলতে হয়। 'তুমি কেমন আছ' কথাটা বলতে হয় 'তুঙি কেঙন আছ'; 'মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলে'র বদলে বলা হয় 'ঙোহনগাগান আর ইস্টগেংগল'।

'ক্লাসফ্রেণ্ড' গল্পটি মনোরম। জীবনে প্রতিষ্ঠিত মোহিতবাবু ক্লাসফ্রেণ্ড জয়দেবকে চিনতে পারেননি। জয়দেব এতই বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। কিন্তু কি অবস্থায় জয়দেবের ছেলের মধ্যে তিনি সেই ক্লাসফ্রেণ্ডের অবিকল প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলেন, সেটি জেনে পাঠক পরম সন্তোষ পেতে পারেন।

সবশেষে সত্যজিতের ভাষার কিছু উদাহরণ তুলে দিই। দেখা যাবে চলতি ভাষার খুব হালফ্যাশনের ভঙ্গি এতে রাখা হয়েছে। যেমনভাবে আমরা কথা বলি বা চিন্তা করি, ভঙ্গিটি তার অবিকল প্রতিচ্ছবি। কথার মধ্যে যখন তখন ইংরেজি শব্দ ব্যবহার এখন বাংলারই একটি আঙ্গিক হয়ে উঠেছে—অনেকের কথোপকথনে। সত্যজিৎ সেটিকে হুবহু ধরেছেন দেখা যাবে। কাটাকাটা সংলাপ তাঁর বিশেষত্ব, সেটি আমরা তাঁর চলচ্চিত্রে দেখে থাকি, এসব গল্পেও তা ধরা পড়ে। পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁর ভাষা কাজ করে অনায়াসে।

"কোথাকার কোন সৌর জগতের এক গ্রহ, তারই একজন লোক—লোক

তো নয়, অ্যাং—তাঁর সঙ্গে আলাপ করে গেল।…আজ,…অন্তত একটা অভিজ্ঞতায়, তিনি সারা পৃথিবীতে এক ও অদ্বিতীয়।

বঙ্কুবাবু দেখলেন, তিনি আর হাঁটছেন না, নাচছেন।"

(বঙ্কুবাবুর বন্ধু)

"আমার মাথায় তো চুল দেখছেন? অথচ…ভূতের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে…হঠাৎ ব্রহ্মতালুর কাছটায় একটা মশার কামড় খেলাম।…অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখি একটিও চুল নেই। … একি আমারই মাথা, না অন্য কারুর মাথায় হাত দিয়ে নিজের মাথা বলে মনে করেছি?"

(অনাথবাবুর ভূত)

"আমি তো গেঞ্জি পরে শুয়েছিলাম—তাহলে আমার গায়ে লম্বাহাতা সিল্কের সার্ট কেন? মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। দরজা খুলে বাইরে এলাম।

চাউ-খি-ডার!

নিজের গলার স্বর চিনতে পারলাম না। উচ্চারণও না।"

(নীল আতঙ্ক)

"অমাবস্যার রাতের অন্ধকারের মতো কালো বেড়ালটা চেয়ারটার দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল…সেই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। কোনো এক অশরীরি বৃদ্ধের খিলখিলে হাসির ফাঁকে ফাঁকে বার বার উচ্চারিত হচ্ছে—সাইমন সাইমন সাইমন।"

(ব্রাউনসাহেবের বাড়ি)

"ভদ্রলোকের হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল। তিনি প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসলেন। তারপর শরীরটাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে নিজেকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে খাটের তলায় অন্ধকারে চলে গেলেন।

"বেশ বুঝতে পারছিলাম যে আমার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে, হাত পা ঠক ঠক করে কাঁপছে।"

(খগম)

"রতনবাবু লক্ষ্য করলেন যে তাঁরই মতো মণিলালবাবুও বেশ পরিষ্কার করে চেটেপুটে খেতে ভালবাসেন, তাঁরই মতো খাবার মাঝখানে জল খান না, তাঁরই মতো ডালের মধ্যে পাতি লেবু কচলে নেন।…"

(রতনবাবু আর সেই লোকটা)

"ফণীবাবু…জানলার দিকে এগোলেন।

তিন পা এগোতেই বাধা পড়ল।

এটা চেয়ার। নবীন তাহলে চেয়ারটাকে সরিয়েছে।

নাঃ এভাবে অন্ধকারে হাতড়ানোর কোন মানে হয় না।…

ফণীবাবু বসলেন। হাতলওয়ালা চেয়ার…একবার যেন মনে হল তার নিজের ঘরের চেয়ারে হাতল নেই, কিন্তু খটকাটা দূর করে দিলেন। মানুষ নিজের ঘরের আসবাবের খুঁটিনাটি সব সময় মনে রাখে না, এই অভিজ্ঞতা তাঁর আজকে হয়েছে।"

(লোডশেডিং)

" 'অন্তত শখানেক কি শদেড়েক যদি এই পুরোন বন্ধুর হাতে তুলে দিতে পার'—

'ভেরি, সরি'।

'অ্যাঁ'?

…নিজেকে শুধরে নিয়ে নরম করে বললেন, 'সরি ভাই। আমার কাছে জাস্ট নাউ ক্যাশের একটু অভাব।'

'আমি কাল আসতে পারি। এনি টাইম।' "

(ক্লাসফ্রেণ্ড)

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই।

সত্যজিৎ রায়ের গল্পের যেসব উদাহরণ দেওয়া হল, তা থেকে, লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে গল্প রচনায় লেখক বিষয়বস্তুর মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছেন। তাঁর কোন গল্পই অন্য কোন গল্পের মতো নয়। ভাষার দিক দিয়েও এগুলোর মধ্যে সমসাময়িক যুগকে ধরা যায়। যেমনভাবে কথোপকথন চলে এখন, সেটিকে প্রায় সময়েই নির্ভুল ধরা হয়েছে। পরিবেশ রচনাটিও ভাষারগুণে মনোরম। চিত্রনাট্য এবং সংলাপ রচনার অভিজ্ঞতা এসব গল্পকে সাহায্য করে থাকবে। আর একটি গুণ আছে তাঁর ভাষার—সেটি হল সরসতা, মৃদুস্মিত কৌতুক-প্রিয়তা বা হৃদ্যতা যে নামেই বলা যাক না কেন—লেখকের প্রসন্নতা এরই মধ্যে দিয়ে পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়।

সবশেষে সত্যজিতের একটি ছড়ার সুরে কবিতা দিয়ে শেষ করছি। এর মধ্যেও দেখা যাবে রচনায় রয়েছে কৌতুক প্রসন্নতা—

"রামফাঁকিবাজ চাকর জোটে সাধনবাবুর ভাগ্যে
বাবু বলেন, 'রোবট রাখি। চাকরগুলো যাক্‌গে।'
রোবট রেখে বাবুর কি হাল
এমনি হল তাঁহার কপাল
রোবট বলে, 'কইরে ব্যাটা।' বাবু বলেন, 'আজ্ঞে।' "

একেবারে সরস ভঙ্গিতে বলা একটি ঘটনা। যান্ত্রিকতা বাড়তে বাড়তে কেমনভাবে মানুষ যন্ত্রের দাস হয়ে যায়, সেটি এতে দ্রুত এবং তীক্ষ্ণভাবে বলা হয়েছে।

গল্প

বিষয় ঃ বাদশাবাঁদী

সুনীল দাশ

হাউসস্টাফ হস্টেল থেকে বেরিয়ে মেডিসিন ওয়ার্ডের দিকে যাওয়ার সময় তীর্থ দেখল একটা বেগুনিরঙের অ্যামবেসেডর থেকে নামিয়ে এমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটি যুবতীকে। পঁচিশ ছাব্বিশের মতো বয়স। পরনে সাধারণ শাড়ি। গায়ের রঙ ফর্সা নয়। চেহারার মধ্যে তেমন আভিজাত্য নেই, তবে যুবতীটিকে নিয়ে এসেছে যারা তারা বেশ বিত্তবান ঘরের—তা দেখলেই বোঝা যায়। কোনো ধনী পরিবারের দুঃস্থ আত্মীয়া হতে পারে। তীর্থ জিজ্ঞাসা করে জানল, এ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল যুবতীটি।

যুবতীটিকে মেডিসিন ওয়ার্ডে আনার পর তীর্থ বুঝতে পারল, যারা ওকে নিয়ে এসেছে তাদের সঙ্গে যুবতীটির সম্পর্ক কি। কার্ডে লেখা হল—নাম কমলাবালা মণ্ডল। কেয়ার অফ সহদেব খৈতান। বিশপ লেফট্‌রয় রোড। ঠিকানা দেখে মেডিসিনের আর এক হাউসস্টাফ বিভাস বলল, 'কাছেই সত্যজিৎ রায়ের বাড়ির রাস্তা। পস্ এরিয়া।'

সহদেব খৈতান দাঁড়িয়েছিলেন অল্প দূরে। ভদ্রলোকের বয়স হবে পঞ্চাশের কাছাকাছি। গেভাডিনের সাদা ট্রাউজার্সের ওপর ঘিয়ে রঙের বুশসার্ট। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। উদ্বেগে ভদ্রলোকের ফর্সা মুখটা লাল হয়ে আছে।

তীর্থ এগিয়ে এসে সহদেব খৈতানকে জিজ্ঞাসা করল, 'পেশেন্ট আপনার কে হন?'

'কমলা কাজ করে আমার বাড়িতে। সি ইজ উইথ আস ফর লাস্ট থ্রি ইয়ার্স। ও এখন আমাদের ফ্যামেলি মেম্বরের মতন।' বিষণ্ণ এবং উদ্বিগ্ন গলায় জানালেন সহদেব খৈতান। বাংলা উচ্চারণে তেমন বিশেষ আলাদা টান নেই। বহুকাল এখানে আছেন।

'কি মনে হচ্ছে আপনার? ও কি বাঁচবে?' জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে চোখে জল এসে পড়ার উপক্রম প্রবীণ খৈতানের।

ব্যাপারটা তীর্থের খুব ভাললাগল। নিজের পরিবারের কেউ নয়, এমন কি দূরসম্পর্কের আত্মীয়ও নয়, বাড়ির তিন বছরের কাজের লোক—তার জন্যে এতোটা দরদ্ সাধারণত দেখা যায় না। তীর্থের অভিজ্ঞতা খুব একটা বেশি নয়। ডাক্তারী পাশ করার পর এক বছর 'ইন্টার্ণ' শেষ করে হাউসস্টাফশিপ করছে এখন।

কমলাবালার আত্মহত্যা করতে যাওয়ার পেছনে কারণ যাইকিছু থাকনা কেন, এই দুর্ঘটনায় খৈতান পরিবারের সকলেই যে খুব উদ্বিগ্ন, বিষণ্ণ সেটা ওদের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

খানিক দূরে যে যুবকটি দাঁড়িয়েছিল, এখন পায়ে পায়ে সেও এগিয়ে এসেছে তীর্থের কাছে। শুনছে তীর্থ কি বলে।

তীর্থ বলল, 'দেখুন, নাইট্রিক এ্যাসিড খাওয়া পেশেণ্ট, বাঁচবে কি বাঁচবে না—এ মুহূর্তে বলা মুশকিল। আমাদের কাজই হচ্ছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে যাওয়া। তবে অনেকটা জলে গেছে তো। ভেতরে পুড়ে গেছে সব।'

সহদেব বললেন, 'ডাক্তারবাবু, ওকে বাঁচানোর জন্যে যত টাকা লাগে আমি ঢালতে রাজি আছি। আমাদের ফ্যামেলিরই একজন হয়ে গেছে কমলা।'

যুবকটি বলল, 'সবসময় আমাদের একজন লোক গাড়ি নিয়ে নিচে ওয়েট করবে। যখন যা কিছু দরকার হবে বলবেন, এনে দেবে।'

তীর্থ যুবকটিকে ভাল করে দেখল এবার। সহদেব খৈতানের ছেলে মনে হচ্ছে। বাপের আদলেই মুখটা। স্বাভাবিকভাবেই একটু বেশি ফ্যাসনদস্তর। স্ট্রেসলনের ট্রাউজার্সের ওপর গোলগলা গেঞ্জি। তীর্থ যুবকটির দিকে তাকিয়ে শুধু বলল, 'বললাম তা, ওকে বাঁচানোর জন্যে আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ফাইট করে যাবো।' বলে তীর্থ ভেতরে চলে গেল।

ভেতরে এসে তীর্থ দেখল স্যার অর্থাৎ ডাক্তার চৌধুরী এসে গেছেন। বিভাস ছাড়াও মেডিসিনের আরো দুজন হাউসস্টাফ এবং নার্শ ঘিরে আছে

কমলাবালা মণ্ডলকে এ্যাণ্টাসিড্ দেওয়া হচ্ছে।

কমলাবালা মণ্ডলের চিকিৎসার সবচেয়ে বড় সংকট হল—ওকে খাওয়ানো। ওর হাতের শিরা দিয়ে কতক্ষণ আর তরল দেওয়া যাবে! তাতে স্পীডও খুব কম। হাত ফুলে যাবে! তাহলে? স্যার ওকে ট্রিট করছেন অন্যভাবে। ওর ডান কাঁধের কাছ থেকে ফুটো করে চালিয়ে দেওয়া হল নল। এইভাবে রাখতে পারলে আশা আছে।

মেডিসিন ওয়ার্ড থেকে হস্টেলে এসে তীর্থ যখন খাওয়ার জন্যে একতলার ক্যান্টিনে নামল সেখানে এখন ক্রিকেট টেস্ট নিয়ে জোর তর্ক চলেছে একটা টেবিলকে ঘিরে। তীর্থ ভিড়ের দিকে এগোল না। আলাদা একটা টেবিলে খেয়ে নিল।

খৈতান পরিবারের উদ্বেগ এবং দুঃখবোধটা তীর্থর খুব ভাল লেগেছে। গোটা পরিবারটাই চলে এসেছে হাসপাতালে। কমলাবালাকে বাঁচানোর জন্যে ওরা সবকিছু করতে রাজি। শুধু একটা জায়গায় একটু খট্‌কা লেগেছে তীর্থর। তীর্থ খৈতানের ছেলেকে যে ক্যাথোডটা কিনতে বলেছিল সেটার দাম সাধারণ ক্যাথোডের তুলনায় দশগুণ বেশি। প্রথমবার খৈতানের ছেলে বলল, 'ঠিক ওই জিনিস তো কোথাও পাচ্ছি না। তবে দেখছি—একটা ঠিক জোগাড় করে আনবোই।' বলে কিছুক্ষণ পর সে যেটা যোগাড় করে এনে দিয়েছিল-সেটা কমদামী লোক্যাল প্রোডাক্টস্। তীর্থ তখন জুনিয়র খৈতানকে দামী ক্যাথোডটা আনার জন্যে একটা মেডিকেল স্টোরের নাম ঠিকানা লিখে দিয়েছিল। জুনিয়র খৈতান খানিকটা অনুনয় করে তখন বলেছিল, 'এটা দিয়েই গলিয়ে দিন না ডাক্তারবাবু।' খানিক আগে যত টাকা লাগুক ঢালবো বলেছে যারা তাদের কাছে এটা ঠিক প্রত্যাশা করা যায় না।

পরেরদিন সকালে হাসপাতালে কমলাবালার কাছে এলেন সহদেব খৈতানের স্ত্রী মহাদেবী খৈতান। ভদ্রমহিলার গাড়ির দিকে তাকিয়ে বোঝা গেল এই খৈতান পরিবারের বেশ কয়েকটি গাড়ি আছে।

রীতিমত খানদানী চেহারা ভদ্রমহিলার। মহাদেবী খৈতানের চোখেও জল ছলছল করছে। ব্যাকুল হয়ে তিনি সিস্টারের কাছে জানতে চাইলেন কমলা বাঁচবে তো? 'হামরা সবসে প্যারা কমলা।' সবচেয়ে প্রিয় কমলা তো তার মেয়ের মতোই। মহাদেবীর কোনো মেয়ে নেই। কমলাই

তার মেয়ে। কমলা না বাঁচলে মহাদেবীর সংসারের এতো যত্ন নিয়ে আর দেখ্‌ভাল করবে কে? বলতে বলতে ভদ্রমহিলা কেঁদে ফেললেন।

ততক্ষণে ওয়ার্ডের মাসিরা এদিক সেদিক থেকে জড়ো হয়ে গেছে। 'যুবতী' এবং 'আত্মহত্যা' দুটো ব্যাপার একসঙ্গে আছে যখন তখন আর মাসিদের ছাথে কে। যেকোনো সরকারী প্রতিষ্ঠানের মতো এখন সরকারী হাসপাতালেও চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারীদেরই দাপট সবচেয়ে বেশি। ওদের কিছু বলার উপায় নেই। রোগীর সামনেই জোর গলায় ওরা যে যার মন্তব্য ছুঁড়ে যাচ্ছে, 'এমনি এমনি কি আর এ্যাসিড খায়রে, বাপু! সোমত্থ মেয়েমাহুষ! কিছু একটা বাধিয়েছে নির্ঘাৎ।' ওয়ার্ডের জমাদারনিরাও পিছিয়ে নেই। তারাও তখন কে কার জীবনে এমন গণ্ডগোলে কেস্ কতগুলো দেখেছে তার ফিরিস্তি দিতে বসে যায়।

নানান কৌতূহল, নানান প্রশ্ন নিয়ে তারা সবাই এখন মহাদেবী থৈতানকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আপাদমস্তক দেখছে। মহাদেবী থৈতানকে দেখার পর একটু দ্বিধায় পড়েছে তারাও। যে বাড়ির লোকজন, মায় গিন্নী পর্যন্ত এমন চোখের জল ফেলে সে বাড়ির লোকজনকে বজ্জাত বলে তো মনে করাও যায় না। তাহলে গণ্ডগোলটা নিশ্চয় বাইরে কোথাও। আশপাশের বাড়ি কিংবা পাড়ার কত দাদাই তো থাকতে পারে গণ্ডগোলের মূলে! বাড়ির কোনো কর্মচারীর থাকাটাও বিচিত্র নয়।

বিচিত্র যে নয়, তার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে আজ সকাল থেকে। জ্বর মস্তানগোছের একাধিক লোককে কমলাবালা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে হাসপাতালে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। অথচ কমলা মেয়েটিকে তো মোটেই তেমন চটকদারী মনে হচ্ছে না। মোটামুটি দেখতে শুশ্রী এইযা। এহেন মেয়ের জন্যে কাছাকাছি মাস্তানদের আনাগোনা ঠিক মেলানো যাচ্ছে না। অবশ্য এসবক্ষেত্রে আর একটা সম্ভাবনাও থাকতে পারে। সেটা হ'ল এই থৈতান পরিবারের কোনোরকমের দুর্বলতাকে এক্সপ্লয়েড করে কিছু খসিয়ে নেওয়ার ধান্ধা। কিন্তু এইসব মাস্তানদের দেখে বরং মনে হচ্ছে এরা এই থৈতানদের হাতের লোক। ব্যবসা এবং রাজনীতি—এই দুটি বৃত্তিতেই মাস্তানপোষা এখন একটি আবশ্যিক কাজ।

কমলাবালা মণ্ডলের আত্মহত্যা করতে যাওয়ার কারণ খানিকটা পরিষ্কার হ'ল মহাদেবী থৈতানের কথা থেকে। সিস্টারকে উনি বললেন ঘটনাটা।

কিছুদিন ধরেই নাকি কমলাবালার বাবার সঙ্গে কমলার খুব ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে। ওর বাবা একবার আসে কমলার মাইনের টাকা নিতে। পরশুদিন বুড়ো দেশে ফিরে যাবার আগে প্রচণ্ড ঝগড়া করে গেছে মেয়ের সঙ্গে। সেই ঝগড়ার পর থেকেই গুম্ হয়েছিল মেয়েটা। রোজ যেমন রান্না করে করেছে, যেমন সকলকে খেতে দেয় দিয়েছে। তবে নিজে খায়নি। হাজার বলেও খাওয়ানো যায়নি মেয়েকে। তারপর বিকেলবেলায়—বাড়ির ছেলেরা যখন কেউ বাড়ি নেই, মেয়েদের দুপুরের ঘুম ভাঙার মুখে—তখনই দোতলার বাথরুম থেকে আর্তচিৎকার শুনে ছুটে গেছে সবাই। গিয়ে ছাখে ওই দৃশ্য। বাথরুম পরিষ্কার করার জন্যে যে নাইট্রিক অ্যাসিড ছিল সেটাই গলায় ঢেলেছে কমলাবালা।

তীর্থ জানাল মহাদেবীকে, 'পেশেণ্টকে কিন্তু আটচল্লিশ ঘণ্টা কারো সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে না।'

'আটচল্লিশ ঘণ্টা! আপনি কি বলছেন ডাক্তারবাবু।'

'আমি একটুও ভুল বলিনি' বলে তীর্থ নিজের কাজে মন দিল। ভদ্রমহিলা বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। হলেও কিছু করার নেই। উনি বসে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিশেব নিতে শুরু করলেন, এপর্যন্ত কমলাবালার জন্যে কি কি ওষুধ বা ইনজেক্‌শন কেনা হয়েছে। তীর্থ বুঝতে পারল পরিচারিকার জন্যে এদের সহানুভূতিটা রীতিমত বিস্ময়কর হলেও—টাকাপয়সার হিসেবে কোথাও ফাঁক নেই।

পরদিন বিকেলে ভিজিটিং আওয়ার্সে আবার কমলাবালার বেডের কাছে মহাদেবী থৈতানকে দেখল তীর্থ। ভদ্রমহিলা কমলাবালা মণ্ডলের মাথার কাছে বসে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, মানুষ খুব কাছের মানুষকে যেভাবে বলে সেইভাবে বলে যাচ্ছেন মহাদেবী থৈতান। উনি বলতে চাইছেন, 'কেন এমন করলি মা। দেখতো, এই যে কষ্ট, এই যে দুর্ভোগ, এসবই তো তোকেই পোয়াতে হচ্ছে।'

কমলাবালা কোন কথা বলতে পারছে না। তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে অনবরত। সাবক্লেভিয়ান ক্যাথিডারাইজেশন করা হয়েছে কমলাবালাকে। ক্ল্যাভিকেল ফুটো করে নিড্‌লটা ঢুকিয়ে দেওয়ায় তরলখাদ্য যাচ্ছে নলের ভেতর দিয়ে। স্যালাইন দিতে গিয়ে থ্রম্ ফ্লেবাইটিকা হয়ে সব ভেন নষ্ট হয়ে যে বিপদ্ দেখা দিয়েছিল—এখন তেমন কোনো বিপদ নেই।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে এক বৃদ্ধকে এসে দাঁড়াতে

দেখা গেল কমলাবালা মণ্ডলের বেডের কাছে। হাঁটুর ওপর তোলা মোটা ধুতি পরনে। ছেঁড়া ময়লা হাল ফ্যাসানের একটা বুশসার্ট—দেখলেই বোঝা-যায়—আর কারো জামা ওটা। ক্ষয়ে যাওয়া রবারের চপ্পল। দূর থেকে দেখেই তীর্থ বুঝতে পারল এই মানুষটা কমলাবালা মণ্ডলের বাবা। এমনিতেই মানুষটার ছোটোখাটো চেহারা, এখন যেন অপরাধবোধের ভারে কুঁকড়ে আরো ছোটো হয়ে গেছে। মেয়ের বিছানার পায়ের দিকটায় এসে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। এতোবড় হাসপাতাল, এতো লোকজন, তারমধ্যে তার মেয়েকে ওভাবে নলবিঁধোনো অবস্থায় শোয়ানো দেখে মানুষটা কিরকম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে।

তীর্থ অবাক হ'ল! এই রকম এক গোবেচারা বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল কমলাবালা! দারিদ্র মানুষের প্রকৃতি বদল করে দেয়। হঠাৎ এক পুলিশ অফিসারকে আসতে দেখে কমলাবালার বাবা আরো জড়োসড়ো হয়ে গিয়ে থৈতানদের একজনের পেছনে চলে গেল।

এই পুলিশ অফিসারটি গতকালও এসেছিলেন কমলাবালার জবানবন্দী নিতে। কমলা যখন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে তখনই এটা এসেছে পুলিশ-কেস্ হিসেবে। তখন রোগীর যা অবস্থা ছিল তাতে তার জবানবন্দী নেওয়ার প্রশ্ন ওঠেনা। পুলিশ অফিসার ভদ্রলোক অবিশ্যি নিয়মিত আসছেন। আজ ভদ্রলোক তীর্থকেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, পেশেণ্টের কণ্ডিশন তো বেশ খানিকটা ইমপ্রুভ করেছে; আমি তাহ'লে আজ ওর স্টেটমেণ্টটা নিয়ে নিচ্ছি।'

'আপনি দয়া করে ওটা আগামী কাল সকালে নিন।'

'আগামী কাল সকাল? কটার সময়?'

'এই আটটা নাগাদ আসুন। আমি থাকবো ওয়ার্ডে।'

'ও থ্যাঙ্কস্ ডক্টর।' বলে পুলিশ অফিসার চলে গেলেন।

মহাদেবী থৈতান তখনও কমলাবালার মাথায় হাত বোলাচ্ছেন আর বলছেন, 'রোও মৎ বেটি, রোও মৎ। কালী মাইয়া সোব সারিয়ে দেবে। সোব বিলকুল ঠিক হোয়ে যাবে।'

পরদিন সকালবেলায় ওয়ার্ডে এসে খবরটা জেনে চমকে উঠল তীর্থ। তীর্থ আটটার দু চার মিনিট আগেই এসেছে। কিন্তু সেই পুলিশ অফিসারটি সাড়ে

সাতটারও আগে এসে কমলাবালার স্টেটমেণ্ট নিয়ে চলে গেছে। কমলাবালা জানিয়েছে, সে নিজের থেকেই এ্যাসিড খেয়েছিল। এরজন্যে সে কোনো-ভাবেই কাউকে দায়ী করছে না।

কমলা বাঁচবে কিনা এই নিয়ে মহাদেবী থৈতানের বারবার প্রশ্ন আর কমলাকে দিয়ে স্টেটমেণ্টটা বলিয়ে নেওয়ার জন্যে পুলিশ অফিসারটির অতিরিক্ত আগ্রহ পাশাপাশি মনে পড়তে থাকল তীর্থর।

তীর্থ কমলাবালার বেডের সামনে এলো। সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে পুলিশকে যে বিবৃতি দিয়েছে সে প্রসঙ্গে এলে, একেবারে চুপ করে থাকল কমলাবালা। তারপর এক সময় অনেকটা নিজেকে বলবার মতো করেই সে বলল, 'ওদের অনেক টাকা খরচ করিয়ে দিলুম ডাক্তারবাবু। এরচেয়ে মরে গেলেই ভাল ছিল। আমার সেরে উঠতে উঠতে আরো কত যে টাকা খরচ হবে ওদের—কে জানে!'

'ওসব নিয়ে আপনি একেবারেই ভাববেন না। মন খুশি রাখুন। যত তাড়াতাড়ি আপনাকে আমরা ভাল করে তুলবো।'

এরপর তীর্থ যা আশঙ্কা করেছিল তাই ঘটল। অর্থাৎ পুলিশ ষ্টেটমেণ্ট নেওয়া হয়ে যাওয়ার পর, থৈতানদের বাড়ি থেকে সেদিন যে শুধু কমলাবালার ভাত এলো না তাই নয়, সেদিন বিকেলের ভিজিটিং আওয়ার্সেও ওর বাবা ছাড়া আর কেউ দেখা করতে এলো না কমলার সঙ্গে।

দু একদিনের মধ্যে সহদেব থৈতান ও তার পরিবারে কমলাবালা মণ্ডলের ভূমিকাটি আরো পরিস্কার হ'ল তীর্থর কাছে। কিছুটা কমলাবালার বাবার কাছ থেকে, বাকিটা কমলাবালার কথার থেকেই অনুমান করতে পারে সে।

এশহরের এক নম্বর থৈতান পরিবারের মতো সহদেব থৈতান এদেশের তেমন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পপতি হতে পারেননি ঠিকই, তবে বাড়িগাড়ি ব্যাঙ্কব্যালেন্স সাদা এবং কালো টাকা তার ক্রমশই বাড়ছে। সম্পদ বাড়াবার জন্যে সহদেব থৈতান খাটেনও খুব। কিন্তু খাটতে গেলে মনটাকে চাঙ্গা রাখার যে ব্যবস্থা-পত্তর করতে হয়, হালফিলের সেই কেতা অভ্যস্থ হতে পারেননি তিনি। তার পরিচিত বড়বড় শিল্পপতিদের মতো নতুন নতুন রক্ষিতা রাখার অবস্থাও তার আসেনি। আর এ ব্যাপারে মহাদেবী থৈতানেরও কড়া নজর আছে। সস্তায় যদি কিছু হয়ে যায় তো তাতে শ্রীমতী থৈতানের তেমন আপত্তি নেই। কেননা সম্পদ বৃদ্ধির পর মহাদেবী থৈতানও তো এদিকসেদিক ঘোরাফেরা শুরু

করেছেন—যা আগে তিনি কখনো করেননি। বয়স একটু বেশি হয়ে গেলেও, সাজগোজও শুরু করেছেন এখন। পার্টিতে যাওয়া ফুর্তি করতে শেখা—একটু বেশি বয়সেই তাকে অভ্যেস করতে হ'ল। তাই মিস্টার থৈতান যখন মাঝে মধ্যে যুবতী রাঁধুনিটিকে ব্যবহার করতে চাইলেন তাতে মহাদেবী থৈতানের দিক থেকে তেমন আপত্তি আসেনি। এ নিয়ে কমলাবালার সঙ্গে কোনো দিন কথা কাটাকাটি পর্যন্ত করেননি মহাদেবী থৈতান।

তার আপত্তির কারণ আলাদা। বিক্রম থৈতান, তাদের একুশ বছরের মেজছেলেটি নাকি এক দুপুরে কমলাবালাকে নিজের ঘরে ডেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। ঘটনাটা জানার পর মহাদেবী থৈতান কমলাবালাকে মার-ধোরও করেছেন। এক মেয়েছেলেকে নিয়ে বাপ এবং ছেলে দুজনেই টানাটানি করবে—এটা তার খুব খারাপ লেগেছিল। বিক্রম অবশ্যি এরপরেই তার ফুর্তি করার জায়গা বেছে নিয়েছিল অন্যত্র।

ও বাড়ি থেকে কমলাবালার পালাবার উপায় ছিল না। আর পালিয়েই বা সে যাবে কোথায়! মাস গেলে বাপ এসে যে মাইনেটা নিয়ে যায় তাতেই গ্রামে টিকে আছে চারটে পেট—মা বাপ ও ছোট দুটি ভাইবোন। মাইনের টাকা ছাড়াও পুরোনো জামা কাপড় ছেঁড়া চাদর সোয়েটার—এটা ওটা দেয় ওরা। অসুখবিসুখ করলে আগামও পাওয়া যায়। ঋণের বোঝা তাতে বেড়েই চলে। কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা বললেই ওরা বলে, সব টাকা মিটিয়ে দিয়ে যাও। নইলে পুলিশে দোবো। কমলাবালা তেমন চালু মেয়ে নয় যে পাল্টা বলবে, 'দাওনা দেখি'।

কিন্তু মরিয়া হয়ে সেদিন কমলাবালা চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'দাও। চলো নিয়ে থানায়। এই নরকে থাকার চেয়ে হাজতবাস ঢের ভালো।'

ব্যস। শোনামাত্তর ক্ষেপে গেলেন সহদেব থৈতান। রাগে থথর করে কেঁপে উঠলেন। 'রাস্তি কাহিকা! আমার ছেলের সঙ্গে মজা মেরে খুব যে চোপা হয়েছে তোর।' বলতে বলতে দুচার থাবড়া তিনি কসিয়েছেন কমলা-বালাকে। আর সেদিনই শেষ দুপুরে অ্যাসিড খেয়েছে কমলাবালা।

দুদিন পরে থৈতানদের এক বাঙালি কর্মচারী চক্রবর্তী এলো তীর্থর কাছে।

তীর্থ বেশ বিরক্তি নিয়ে বলল, 'কি মশাই, আপনাদের আর একজনেরও যে

পাত্তা নেই। 'স্টেরোয়েড' কিনে দেবেন বলে সেই যে গেলেন মিসেস থৈতান—তারপর এই বুড়ো বাপটি ছাড়া আর একজনেরও দেখা নেই!'

'দেখেছেন তো স্যার। কদিন ওষুধ ইনজেক্সনে তো এদের কম খরচটা হ'ল না। আমি বলছিলুম কি, স্যার, এদের পেশেন্টের—মানে ওই কমলা-বালার মেডিসিনটা ফ্রি করানো যায় না?'

'সে কি! আপনারা তো বলেছিলেন—টাকা যত লাগে ঢালবেন। এখন বলছেন ফ্রি—'

'ফ্রি বেড নয় স্যার—শুধু মেডিসিনটার কথা বলছিলেন মিসেস থৈতান। তারজন্যে স্যার যা—'

'ভদ্রমহিলাকে বলবেন—আমার সঙ্গে দেখা করে যেতে।'

'বলবো স্যার। নিশ্চয়ই বলবো।' বলে চক্রবর্তী চলে গেছিল।

পরদিন সন্ধেবেলায় ওয়ার্ডে আসতে আধঘণ্টাটাক দেরি হয়েছে তীর্থর। সে ঢুকেই দেখল মহাদেবী থৈতান দাঁড়িয়ে। বেশ চড়া সাজ। তীর্থকে দেখা মাত্র ভদ্রমহিলা অভিযোগ করলেন, 'আরে ডাক্তারবাবু, আমাকে আসতে বলে আপনি দেখি নিজেই আসছেন না। আমি কখন থেকে ওয়েট করছি।'

কথাবলার ধরণ দেখে চটে গেল তীর্থ, বলল, 'দরকার হ'লে আরো বেশি সময় ওয়েট করতে হ'তো। প্রয়োজনটা তো আপনার। আপনি আপনার পেশেন্টের জন্যে ওষুধ কিনে দিচ্ছেন না কেন?'

'আরে ডাক্তারবাবু, আপ্ ইত্না কস্টলি মেডিসিন লিখদিয়া।—এ ক্যা—'

'পেশেন্টের এটা প্রয়োজন তাই লিখেছি।'

'আরে ডাক্তারবাবু, কমলা কি আমার রিলেটিভ? ওর জন্যে আর কত স্পেণ্ড করবো?'

'সারাতে গেলে করতে হবে।'

'ওদের কুকুর বেড়ালের মতো জান ডাক্তারবাবু। ওর জন্যে আমায় ফতুর হতে বলবেন না।'

তীর্থ অবাক হয়ে ভাবল, এই মহাদেবী থৈতানই কদিন আগে কলমাবালার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বেটি বেটি করছিল।

মিসেস থৈতান এরপর বললেন, 'মেডিসিনটা ফ্রি করে দিন। আমরা তো বেডের ফি দিচ্ছি।'

করেছেন—যা আগে তিনি কখনো করেননি। বয়স একটু বেশি হয়ে গেলেও, সাজগোজও শুরু করেছেন এখন। পার্টিতে যাওয়া ফুর্তি করতে শেখা—একটু বেশি বয়সেই তাকে অভ্যাস করতে হ'ল। তাই মিস্টার খৈতান যখন মাঝে মধ্যে যুবতী রাঁধুনিটিকে ব্যবহার করতে চাইলেন তাতে মহাদেবী খৈতানের দিক থেকে তেমন আপত্তি আসেনি। এ নিয়ে কমলাবালার সঙ্গে কোনো দিন কথা কাটাকাটি পর্যন্ত করেননি মহাদেবী খৈতান।

তার আপত্তির কারণ আলাদা। বিক্রম খৈতান, তাদের একুশ বছরের মেজছেলেটি নাকি এক দুপুরে কমলাবালাকে নিজের ঘরে ডেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। ঘটনাটা জানার পর মহাদেবী খৈতান কমলাবালাকে মার-ধোরও করেছেন। এক মেয়েছেলেকে নিয়ে বাপ এবং ছেলে দুজনেই টানাটানি করবে—এটা তার খুব খারাপ লেগেছিল। বিক্রম অবশ্যি এরপরেই তার ফুর্তি করার জায়গা বেছে নিয়েছিল অন্যত্র।

ও বাড়ি থেকে কমলাবালার পালাবার উপায় ছিল না। আর পালিয়েই বা সে যাবে কোথায়! মাস গেলে বাপ এসে যে মাইনেটা নিয়ে যায় তাতেই গ্রামে টিকে আছে চারটে পেট—মা বাপ ও ছোট দুটি ভাইবোন। মাইনের টাকা ছাড়াও পুরোনো জামা কাপড় ছেঁড়া চাদর সোয়েটার—এটা ওটা দেয় ওরা। অসুখবিসুখ করলে আগামও পাওয়া যায়। ঋণের বোঝা তাতে বেড়েই চলে। কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা বললেই ওরা বলে, সব টাকা মিটিয়ে দিয়ে যাও। নইলে পুলিশে দোবো। কমলাবালা তেমন চালু মেয়ে নয় যে পাল্টা বলবে, 'দাওনা দেখি'।

কিন্তু মরিয়া হয়ে সেদিন কমলাবালা চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'দাও। চলো নিয়ে থানায়। এই নরকে থাকার চেয়ে হাজতবাস ঢের ভালো।'

ব্যস। শোনামাত্তর ক্ষেপে গেলেন সহদেব খৈতান। রাগে থথর করে কেঁপে উঠলেন। 'রাণ্ডি কাহিঁকা! আমার ছেলের সঙ্গে মজা মেরে খুব যে চোপা হয়েছে তোর!' বলতে বলতে দুচার থাবড়া তিনি কষিয়েছেন কমলা-বালাকে। আর সেদিনই শেষ দুপুরে এ্যাসিড খেয়েছে কমলাবালা।

দুদিন পরে খৈতানদের এক বাঙালি কর্মচারী চক্রবর্তী এলো তীর্থর কাছে।

তীর্থ বেশ বিরক্তি নিয়ে বলল, 'কি মশাই, আপনাদের আর একজনেরও যে

পাত্তা নেই। 'স্টেরায়েড' কিনে দেবেন বলে সেই যে গেলেন মিসেস খৈতান—তারপর এই বুড়ো বাপটি ছাড়া আর একজনেরও দেখা নেই!'

'দেখেছেন তো স্যার। কদিন ওষুধ ইনজেক্সনে তো এদের কম খরচটা হ'ল না। আমি বলছিলুম কি, স্যার, এদের পেশেন্টের—মানে ওই কমলা-বালার মেডিসিনটা ফ্রি করানো যায় না?'

'সে কি! আপনারা তো বলেছিলেন—টাকা যত লাগে ঢালবেন। এখন বলছেন ফ্রি—'

'ফ্রি বেড নয় স্যার—শুধু মেডিসিনটার কথা বলছিলেন মিসেস খৈতান। তারজন্যে স্যার যা—'

'ভদ্রমহিলাকে বলবেন—আমার সঙ্গে দেখা করে যেতে।'

'বলবো স্যার। নিশ্চয়ই বলবো।' বলে চক্রবর্তী চলে গেছিল।

পরদিন সন্ধেবেলায় ওয়ার্ডে আসতে আধঘন্টাটাক দেরি হয়েছে তীর্থর। সে ঢুকেই দেখল মহাদেবী খৈতান দাঁড়িয়ে। বেশ চড়া সাজ। তীর্থকে দেখা মাত্র ভদ্রমহিলা অভিযোগ করলেন, 'আরে ডাক্তারবাবু, আমাকে আসতে বলে আপনি দেখি নিজেই আসছেন না। আমি কখন থেকে ওয়েট করছি।'

কথাবলার ধরণ দেখে চটে গেল তীর্থ, বলল, 'দরকার হ'লে আরো বেশি সময় ওয়েট করতে হ'তো। প্রয়োজনটা তো আপনার। আপনি আপনার পেশেন্টের জন্যে ওষুধ কিনে দিচ্ছেন না কেন?'

'আরে ডাক্তারবাবু, আপ্ ইত্না কস্টলি মেডিসিন লিখদিয়া।—এ ক্যা—'

'পেশেন্টের এটা প্রয়োজন তাই লিখেছি।'

'আরে ডাক্তারবাবু, কমলা কি আমার রিলেটিভ? ওর জন্যে আর কত স্পেণ্ড করবো?'

'সারাতে গেলে করতে হবে।'

'ওদের কুকুর বেড়ালের মতো জান ডাক্তারবাবু। ওর জন্যে আমায় ফতুর হতে বলবেন না।'

তীর্থ অবাক হয়ে ভাবল, এই মহাদেবী খৈতানই কদিন আগে কলমাবালার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বেটি বেটি করছিল।

মিসেস খৈতান এরপর বললেন, 'মেডিসিনটা ফ্রি করে দিন। আমরা তো বেডের ফি দিচ্ছি।'

'ফ্রি করে দিন বললেই তো আর ফ্রি হয় না।'

'ঠিক আছে—কিছু টাকা খাওয়াতে হয় তো খাওয়াবো—'

'আপনি কি বলতে চাইছেন?' তীর্থ ধমকে উঠল।

মহাদেবী খৈতান একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে চলে গেলেন। ভাবখানা—ঠিক আছে যা করার যেখানে যতটুকু ঢালার আমিই ঢালবো।

সেদিন সন্ধের পর হাসপাতালের অফিস দপ্তরে এসে তাজ্জব বনে গেল তীর্থ। এটুকু সময়ের মধ্যে কমলাবালার মেডিসিন ফ্রি করার সুপারিস এসে গেছে বেশ উঁচুতলা থেকে!

তীর্থর বিস্ময়ের আরো কিছু বাকিছিল এখনো।

দুদপ্তা কেটে যাওয়ার পর, কমলাবালা যখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠল—পরের সপ্তাহে ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে এমন অবস্থা, দেখা গেল—ভিজিটিং আওয়ার্সে আবার মহাদেবী খৈতান আসতে শুরু করেছেন। একদিন সহদেব খৈতানও এলেন!

সিস্টার আর মাসিদের কাছ থেকে খবর পায় তীর্থ, মিসেস খৈতান আবার প্রথম দিককার মতো দরদ দেখাতে শুরু করেছেন। যেন ঘরের মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দিন গুণছেন। তীর্থ লক্ষ্য করল, সিস্টার এবং মাসিদেরও বেশ একটা সহানুভূতি তৈরি হয়েছে কমলাবালার জন্যে।

সেদিন বিকেলেই কমলার বাবা এসে ধরল তীর্থকে, বলল, 'আমাদের বাঁচান ডাক্তারবাবু। ওরা বলচে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই সোজা ওরা আবার নিয়ে যাবে ওদের বাড়িতে। মেয়েটা আর ও মুখো হতে চায়না ডাক্তারবাবু!'

তীর্থ শুনল শুধু। কোনো উত্তর করল না। পরদিন সকালে রাউণ্ড দিতে এসে কমলার বেডের কাছে যাওয়ামাত্র কমলাবালাও বলল, 'ডাক্তারবাবু, কেন বাঁচালেন আমাকে। এরচেয়ে তো আমি মরে গেলেই বাঁচতুম!'

তীর্থ তাকাল কমলাবালার দিকে। বোঝা যায়, বুকের সবটুকু সাহস জড়ো করে, মরিয়া হয়ে কমলাবালা কথাটা বলেছে তাকে।

'ওরা বলছে—ওরা আমার জন্যে হাজার হাজার টাকা খরচ করেছে, জীবন দিয়েছে, বলছে এই ফিরে পাওয়া জীবনটা দিয়ে ওদের এই ঋণের খানিকটাও যদি শোধ না করি, তবে আমার অধর্ম হবে।'

'জানিয়ে দেবেন ওরা হাজার হাজার টাকা খরচ করেনি। ওরা কোনো আইনেই আপনাকে ওদের বাড়িতে কাজ করাতে বাধ্য করতে পারে না।'

'ডাক্তারবাবু, আপনাকে বোঝাতে পারবো না যে ওরা কেমন ভয়ানক মানুষ! নিজেদের এতটুকুন সুবিধের জন্যে দশটা দুবলা লোকের মহাসর্বনাশ করতেও এটুটু বাধবেনা ওদের। এখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে একবার ওদের বাড়িতে ফেলতে পারলে আর কি আমার রেহাই আছে। সারাজীবন বাঁদী বানিয়ে রাখবে। আইনটাইনের ধার ধারে না ওরা। ডাক্তারবাবু আমি যদি এখান থেকে ছাড়া পেয়ে বাবার সঙ্গে দেশে চলে যেতে পারতুম!'

'দরকার হলে তাই যাবেন।'

'সাধ্যি কি আমার যাই? খালাসের দিন দেখবেন আগের থেকেই গাড়ি নিয়ে কর্তাগিন্নী দাঁড়িয়ে আছে।' বলতে বলতে কমলাবালা কেঁদে ফেলল।

তীর্থ আর সময় দিতে পারল না, চলে এল। কিন্তু ম্যাকেঞ্জিওয়ার্ডের লম্বা করিডোর পেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে কমলাবালা মণ্ডল নামে বিশ শতকের আটের দশকের এক ক্রীতদাসী ও তার বুড়ো বাবার অসহায়তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না। বাইরে এসে মুখ তুলে মাথার ওপরের নীল আকাশের দিকে তাকাতে পারল না।

মানুষকে রোগমুক্ত করানো ছাড়া আর কোনো মুক্তির দায় নেই তীর্থের। কমলাবালাকে বাঁচিয়ে তোলা ফাঁসির আসামীকে বাঁচিয়ে তোলার মতো হলেও সেটাই তার কাজ।

চকিতে একটা চিন্তা ঝলসে ওঠে তীর্থর মাথায়। ডাক্তার হিশেবে এটা হয়তো তার বলা উচিত নয়, তবু ন্যায় অন্যায় সব হিশেব ফেলে রেখে, মাঝপথ থেকে তীর্থ আবার ফিরে আসে ওয়ার্ডে। সিস্টার অমিতা এবং আয়া রাণীমাসীকে ডেকে বলে, 'আপনারা তো কমলাবালার সব কথাই জানেন। আমাদের কিছু করার নেই। শুধু একটা উপায় মনে হ'ল, কোনো পেশেণ্ট যদি রিলিজ হওয়ার আগের দিন হস্পিটাল থেকে পালিয়ে যায় তাহলে আমাদের তো কোনো দায় থাকে না।' কথাটা বলেই তীর্থ ফিরে গেল। ফিরে আসতে আসতে পেছনে রাণীমাসির গলা শুনল। রাণীমাসি হাসতে বলছে, 'আমরাও সেইটে ভেবেছি ডাক্তারবাবু।'

পরশু কমলার রিলিজ। আজ বাবাকে বলে ও সব ঠিকঠাক করে রেখে, আগামী কাল কোনো একসময়ে পালিয়ে যাবে। সহদেব খৈতান এসে দেখবেন পেসেণ্ট কমলাবালা মণ্ডল পালিয়েছে।

ওয়ার্ডের বাইরে এসে মাথার ওপরের নীল আকাশকে বেশ উজ্জ্বল মনে হল তীর্থর।

ফরাসী বিপ্লব ও বাঙালী সমাজ

(১৭৮৯—১৮৩১)

সুরেশচন্দ্র মৈত্র

এক

ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধ স্বদেশে সম্পূর্ণ সার্থক; কিন্তু তার বিশ্ব-তাৎপর্য অকিঞ্চিতকর। আর ফরাসী বিপ্লব স্বদেশে ব্যর্থ, কিন্তু তার বিশ্বতাৎপর্য-অপরিসীম।

ঐতিহাসিকদের এই বক্তব্যে হয়ত কিছু অতি-সরলীকরণ আছে, কিন্তু সর্বাংশে অগ্রাহ্য করার মতো নয়।

বিশ্বের ইতিহাসে এতকাল কেবল যুদ্ধ ছিল, সরকারের পরিবর্তন ছিল, কিন্তু বিপ্লব ছিল না। ফরাসীরা শুধু সরকার পালটাল নয়, লড়াই করল না, একটা নতুন আদর্শ স্থাপন করল।

প্রথম ফরাসী বিপ্লব না হলে দার্শনিকেরা কোনকালে দর্শন-চিন্তাকে মানব-জীবন, তথা বাস্তব সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করতেন না। হেগেলের 'ডায়ালেক্‌টিস্-' চিন্তা ফরাসী বিপ্লব ব্যতীত সম্ভব হোত না; কাণ্টের দর্শন-চিন্তাও ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের মৌল জিজ্ঞাসাটিকে আমাদের সর্বপ্রথমে বুঝতে হবে। এটি না বুঝলে আমরা বৃটেনের তথাকথিত 'গৌরবজনক বিপ্লব' (Glorious Revolution) এর সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের গুরুত্বকে একাসনে বসিয়ে দেব। ফরাসী বিপ্লবীরা কেবল নিজেদের দাবীদাওয়ার কথা বললো না। সর্বদেশের সাধারণ মানুষের (Common Man) কথা বললো। এদের যুক্তিতর্কের ভাষা তাই সর্বজনীন (cosmopolitan) ভাষা,

প্রাদেশিক ভাষা নয়। ইংরাজ নাগরিকেরা লড়েছিল তাদের নাগরিক অধিকার ও পার্লামেন্টের সুবিধাসমূহ (Privileges) রক্ষার জন্য।

১৭৮৯ খৃস্টাব্দে ১৪ই জুলাই বাস্তিলের পতন হোল; প্যারিসের জনগণ লোকায়ত সরকার (Commune) প্রতিষ্ঠা করল। গণফৌজ গঠন করল লোকায়ত সরকারের স্থায়ীত্বের জন্য। শহর ছেড়ে আন্দোলন গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ল; কৃষকেরা বিদ্রোহ করে ভূম্যধিকারীদের প্রাসাদ আক্রমণ করল, জমির পাট্টা-দলিল পুড়িয়ে দিল।

এই পর্যন্ত দেখলে মনে হবে ফরাসী বিপ্লব বুঝি একান্তভাবেই ভাঙ্গনের কাজে মত্ত; পুরাতনের ধ্বংস সাধনই ফরাসী বিপ্লবীদের একমাত্র কাজ। ১৭৮৯ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে অর্থাৎ বাস্তিল দুর্গ পতনের তিন মাস অতিবাহিত না-হতে তারা দাখিল করল, "Declaration of Rights of Man & Citizen" এই ঘোষণা সম্বলিত দলিল বিশ্বের তাবৎ মুক্তিকামী মানুষের বড় প্রিয়, কারণ এর থেকে তারা অনুপ্রেরণা লাভ করে।

১৭৯১ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট ষোড়শ লুই দেশ থেকে পলায়নের মতলব করলেন; দিনটি ছিল ২১শে জুন। সীমান্তের কাছে তিনি ধরা পড়ে গেলেন। বাস্তিল পতনের এক বছর পরে বুরবঁ রাজবংশের শাসনের অবসান ঘোষণা করল জনগণ। এক রাজতন্ত্রকে উৎখাত করে আর এক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যেখানে এক রাত্রির অবকাশও মেলে না, সেখানে 'অনাচারী' জনগণ এক বছর অপেক্ষা করেছে।

ফরাসী বিপ্লবীরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। নেতৃত্বে ছিল বুদ্ধিজীবীরা; তারা এসেছে মধ্যবিত্ত বণিক সমাজ থেকে। ফলে আত্মকলহ দেখা দিল; কিছুটা শ্রেণী-স্বার্থ-জনিত, কিছুটা মত পার্থক্য জনিত। ফলে ধীরে ধীরে কার্সিকার এক আভিজাত্যশূন্য অথচ উচ্চকাঙ্ক্ষী সেনানায়ক নানা সামরিক সাফল্যের উত্তাল উৎসবের মধ্য দিয়ে এসে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর সাফল্য দ্রুত মিশর পর্যন্ত এসে পৌছোল; যত দ্রুত অগ্রসরণ, তত দ্রুত অবলুপ্তি। ১৮১৫ খৃস্টাব্দে ওয়াটারলুর রণক্ষেত্রে নেপোলিয়ন পরাজিত হন। ওই রাজরক্তহীন সম্রাট ১৪ই জুন বন্দী হলেন। তাঁকে একটি নির্জন দ্বীপে আটক রাখা হোল। ইউরোপের মিলিত শাসকবর্গ বরখাস্ত বুরবঁ রাজবংশের এক সন্তানকে খুঁজে পেতে বের করে সিংহাসনে বসাল। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জনগণ যেসব অধিকার

অর্জন করেছিল, তা কেড়ে নেওয়া হোল। তাদের ভয়, ফ্রান্সের জনগণের দৃষ্টান্ত তাদের দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করবে।

কিন্তু ভলটেয়ার, দিদারো, কাণ্ডারের দেশ বেশি দিন আত্মবিস্মৃত থাকেনি। ১৮৩০ খৃস্টাব্দে সেই জুলাই মাসে আবার ফ্রান্সের জনগণ স্বৈরাচারী শাসনের উৎখাতে পথে নেমে পড়ল। জনগণকে শায়েস্তা করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে ডাকা হোল; কিন্তু রাজকীয় সেন্যবাহিনী জনগণের উপর আক্রমণ চালাতে অস্বীকৃতি জানাল। প্যারিসের বৃহত্তর জনসমাজ বুরবঁ বংশের আধিপত্যের অবসান ঘোষণা করল। রক্তপতাকায় রাজপথ সুশোভিত হোল। ফ্রান্সের আবার সেই পুরাতন মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করল—

—যেখানে শৃঙ্খলার অর্থ দাসত্ব সেখানে বিশৃঙ্খলাই আমাদের কাম্য।

—চাই ঔদ্ধত্য, আরো ঔদ্ধত্য, নিরন্তর ঔদ্ধত্য।

দুই

ফরাসী বিপ্লবের দুইটি পর্ব। ভারতবর্ষের লোক দুইটি পর্ব সম্বন্ধেই অবহিত। এবং কোথাও কোথাও তার প্রভাবও পড়েছে। হিকীর গেজেটের সুপরিচিত সম্পাদক হিকী তাঁর স্মৃতিকথায় (১৭৯০-১৮২৫) লিখছেন, 'গত অক্টোবর মাসে আমার বোন ফরাসী বিপ্লবের ওপর লেখা বার্কের বই একখণ্ড পাঠিয়ে দিল। গ্রন্থে বার্ক নাকি তাঁর প্রতিভার অসাধারণ পরিচয় দিয়েছেন। কলকাতা শহরে বইখানির চাহিদা দেখে পুনর্মুদ্রিত করা হোল। দুটি সংস্করণ কয়েকদিনের ব্যবধানে ছাপা হোল'।[১] ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরোধী বলে বার্ক মহাশয় কলকাতার ইংরেজ মহলে আদৌ জনপ্রিয় ছিলেন না। কিন্তু গরজ বড় বালাই; সেই অপ্রিয় ব্যক্তির বই বিপ্লব-বিরোধী বলে সাদরে গৃহীত হোল। কার উদ্যোগে বইখানি পুণর্মুদ্রিত হয় হিকী মহাশয় তাঁর নাম জানান নি। অন্য সূত্রে তাঁর নাম পাওয়া গেল—তাঁর নাম টমাস হোয়াটলি (Thomas Whatley)[২]। শুধু বার্কের বই-এর পুনর্মুদ্রণ হোল, এই খবর হিকী চুপ থাকেন নি। গঙ্গার দুই তীরে ফরাসী বিপ্লবের খবর কিরকম প্রভাব ফেলেছিল, তার গল্পও তিনি আমাদের শুনিয়েছেন। খবর পরিবেশনার ভাষা থেকে বোঝা গেল, ব্যাপারটা মোটেই তার মনঃপূত নয় (এদেশের হিকী প্রেমিকরা আমায় ক্ষমা করবেন।) তিনি লিখছেন, ফরাসী-দের বৈপ্লবিক ধ্যাপামি গঙ্গার দুই তীরে অনিষ্টকর প্রভাব ফেলল। এক দল

ভবঘুরে, বেকার ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক এ নিয়ে মাতামাতি করছে, তাদের সঙ্গে ভিড়েছে প্রধান পাচক, কেশপ্রসাধনকারী অর্থাৎ নাপিত ও গৃহভৃত্যেরা। এর মধ্যে কোন ভদ্রলোক নেই। কিন্তু শেষে তিনি বলতে বাধ্য হলেন এই অনাচারীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন একজন অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি, তাঁর নাম রিচর্ম (Richmond)। ইনি হলেন চন্দননগর কোর্টের চীফ জাস্টিস।[৩]

হিকীর স্মৃতিকথার ওপর আমাদের একান্ত ভরসা করার দরকার দেখি না। সাময়িক পত্রে এর খবর অনেক পাওয়া যাচ্ছে। ১৭৯২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত পণ্ডিচেরীতে বিপ্লবপন্থী ও বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষ চলেছে।[৪] আবার চন্দননগরের আগুনও নিভছে না, বিপ্লবপন্থীরা সরকারী চাপ প্রতিহত করে চলেছে।

ফ্রান্সের সকল উপনিবেশেই এই রকম সংঘর্ষ চলতে থাকে। জনৈক ফরাসী গবেষক সে বিবরণ সংকলিত করেছেন। আমরা তাঁর সহযোগিতা নিচ্ছি।[৫]

ফ্রান্সে যে গোলযোগ শুরু হয়েছে, এখবর ফরাসী সূত্রে ভারতে আসেনি, এসেছে ইংরাজদের সূত্রে। পরে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৭৯০ সালে ফ্রান্স থেকে একটি জাহাজ পণ্ডিচেরীতে এসে পৌছোল; তারা ফলাও করে খবরটি দিল। পণ্ডিচেরীর ফরাসীরা দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে কতটা নাক-গলানো উচিত; তাই নিয়ে বেশি ভাবিত ছিল, দেশের সমস্যা নিয়ে তত নয়। খবরটি শুনে তারা হকচকিয়ে গেল। এতকাল পরে তারা বুঝতে পারল যে এক পুরাতন শাসনযন্ত্রের জন্যই তারা এত কষ্ট ভোগ করছে, কোনো দিকে এগোতে পারছে না। অতএব পণ্ডিচেরীর নাগরিকবৃন্দ এক সাধারণ সভায় মিলিত হোল; ২৫শে ফেব্রুয়ারীর এই সভায় তারা এক নাগরিক ফৌজ (Citizen's militia) গঠন করল; গভর্ণরের কাছে দাবী জানাল অস্ত্রাগার (Armovry) তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। বলা যায়, পণ্ডিচেরীতে 'বিপ্লব' শুরু হয়ে গেল। তবে প্যারিস বা চন্দননগরের মতো তারা কোন প্রকার 'বাড়াবাড়ি' করল না। তারা ফরাসী নাগরিক ছাড়া অন্য কাউকে তাদের দলভুক্ত করল না, দেশীয়রা বাইরে থাকল। ফ্রান্সের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বিশ্বজনীনতা এইভাবে শোধন করা হোল। তবে কেউ-কেউ চাইলেন অন্তত পৌরসভা পরিচালনার কাজে ভারতীয়দের ডাকা হোক। প্রধানব্যক্তিরা এতেও প্রমাদ গুণলেন। যারা ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তির জন্য চেঁচামেচি

করছিলেন, তাদের মধ্য থেকে সাতজনকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ঘোষণা করে জোর করে জাহাজে তুলে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেওয়া হোল। এই নির্বাসিত ব্যক্তিরা প্যারিসে এসেও চুপ করে গেলেন না; জাতীয় পরিষদের কাছে তাঁরা তাঁদের বক্তব্য পেশ করলেন। জাতীয় পরিষদ তাঁদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা মেনে নিলেন। এবং ঐ ব্যক্তিদের পণ্ডিচেরী ফিরে যাবার অধিকার মঞ্জুর করলেন।

ফ্রান্সে এর পর রাজতন্ত্র উৎখাত হোল—এখবর পণ্ডিচেরীতে পৌছালে আবার এক দফা উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল।

—ফ্রান্স দীর্ঘজীবী হোক।

—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

—প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক।

এইসব ধ্বনিতে রাস্তাঘাট মুখরিত হয়ে উঠল। বৈপ্লবিক কায়দায় অভিবাদন শুরু হোল, জাতীয় সেনাবাহিনী গঠিত হোল, শহর আলোকমালায় সাজান হোল। সংবাদে বলা হচ্ছে, ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে ১লা ও ২রা এপ্রিল পণ্ডিচেরী উৎসব নগরীর রূপ গ্রহণ করল।

চন্দননগরের গল্প আগে কিছু বলেছিলাম। রীচর্মর প্রসঙ্গে বলেছি। রিসর্ম টাকাপয়সার গরমিল করার জন্য বরখাস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে পুনর্বহাল করা হোক, এই দাবী জানাতে তিনি প্রধান দপ্তর পণ্ডিচেরীতে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর আশা পূরণ হোল না; বরং উল্টে তাঁরা তাঁর পদে নতুন লোক নিয়োগ করেছিলেন। ফলে তিনি বিপ্লবের পথ অনুসরণ করলেন। ৩০শে এপ্রিল এক সভা ডেকে নাগরিকদের সাধারণ পরিষদ গঠন করলেন; সভায় উপস্থিত ছিলেন সর্বসাকুল্যে ৪৩ জন।

৩রা মে আর একটি সভা আহূত হোল। এই সভা থু ভেরিনিস (De Verinnes) ও টিংগলারকে (Tingler) যথাক্রমে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা হয়। শাসনকার্য দেখাশুনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হোল,—রিচর্ম এই কমিটির একজন সদস্য হলেন। নগরের ফরাসী সৈন্যবাহিনীর অধিকর্তা এসে এঁদের কাছে আনুগত্যের শপথ নিলেন। প্রাদেশিক গভর্ণরের কাছে এক দাবীপত্র পাঠান হোল; তাতে বলা হোল, আফিম, গন্ধক প্রভৃতি কেনাবেচার সমস্ত লভ্যাংশ এই বিপ্লবী সরকারের কাছে জমা দিতে হবে। ভারতে অবস্থিত ফ্রান্সের অন্যান্য উপনিবেশ এর কোন ভাগ পাবে না। ফরাসী গভর্ণর সে দাবী মেনে নিলেন না। তখন

বিপ্লবী পরিষদ গভর্ণর বা Council কে বাতিল করে দিল, রিচর্মকে তার পূর্বতন পদ Procureur বা চীফ জাষ্টিসের পদে বহাল করল। চন্দননগরবাসী মিছিল করে গিয়ে কাউন্সিল-ভবন দখল করল। ফরাসী গভর্ণর বা Council এই গণ্ডগোলের মধ্যে গোপনে পালিয়ে গেলেন। বিপ্লবীরা এ খবর জানতে পেরে তাকে বরখাস্ত করল। কলকাঠি নাড়ছিল ইংরেজরা; বিশেষ করে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র মহান জনক লর্ড কর্ণওয়ালিস। চন্দননগরের গভর্ণর মন্টিংনি (Montigny) কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে বসে ফন্দি আঁটতে লাগলেন কি করে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সহায়তায় চন্দননগর ছিনিয়ে নেওয়া যায় বিপ্লবীদের কবল থেকে। চন্দননগরের চার পাশে দু হাজার ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন করা হোল। এবং দাবী জানান হোল, বন্দিদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। তখন রিচর্মর নেতৃত্বে পরিষদ পাল্টা হুমকি দিল ইংরেজ বাহিনী যদি সরে না দাঁড়ায়, তবে সব বন্দীকে কোতল করা হবে। তখন ইংরেজ বাহিনী প্রত্যাহৃত হোল; মন্টিংনিকে ফিরে যেতে বলা হোল। ভদ্রলোক ফিরে এলেন, এবং গ্রেপ্তার বরণ করলেন। ১লা অক্টোবর তাঁকে এক জাহাজ যোগে ফ্রান্সে পাঠান হোল। সেখানে জাতীয় পরিষদ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। কিন্তু ইংরেজরা সে জাহাজ আটক করল; মন্টিংনী ও তার অনুচরদের মুক্ত করে কলকাতায় নিয়ে এল।

ইংরেজদের উসকানিতে চন্দননগর থেকে কিছু ব্যবসায়ী কলকাতায় চলে এল—ঠাকুর, শীল, মল্লিকেরা কলকাতায় ও চন্দননগরে একই সঙ্গে ব্যবসা করত। তারা চলে এল, তাদের অভিযোগ যে তাদের কাছ থেকে জোর করে 'ঋণ' আদায় করা হচ্ছে। দেশীয় বণিকদের একটা বড় অংশ স্থান ত্যাগ করায় চন্দননগরের ব্যবসা বাণিজ্য খুব ক্ষতিগ্রস্ত হোল। বিপ্লবীরা কিন্তু এতেও দমল না, তারা নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করল; তাতে অবশ্য রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধার মোটা অংশই ফরাসী সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজের জন্য সংরক্ষিত ছিল; শুধু বিচার বিভাগে দেশীয়দের কিছু অংশ দেওয়া হোল। বিচার ব্যবস্থার জন্য দুইটি ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হোল, একটি ফরাসীদের জন্য, অপরটি ভারতীয়দের জন্য। ভারতীয়দের জন্য যেটি গঠিত হোল, তাতেও বিচারপতি হবেন একজন ফরাসী, কিন্তু তাঁর সহায়ক হবেন একজন ভারতীয়। ইনি ভারতীয়দের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

ফ্রান্সের বিপ্লব কেবল ফরাসীদের জন্য নয়, এই ছিল বিঘোষিত নীতি।

কিন্তু উপনিবেশে এসে তার চরিত্র নবরূপ পেল।[৬] অবশ্য পণ্ডিচেরী থেকে এখানে একটু উন্নতি হয়েছে।

শীঘ্রই ইউরোপ ভূখণ্ডে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হোল—চন্দননগর পণ্ডিচেরীর সব আন্দোলন ধামা চাপা পড়ে গেল।

আর এই যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে পর্তুগীজ, ডেনমার্ক-অধিবাসীরা ও ওলন্দাজরা চুটিয়ে ব্যবসা করে বিত্তবান হয়ে গেল। কলকাতা ও তার আশে পাশে পর্তুগীজদের এই সময় আর্থিক উন্নতি দেখা দেয়। ১৭৯৮ খৃস্টাব্দে এই যুদ্ধ শুরু হয়। কলকাতার কাগজে কাগজে চেঁচামেচি শুরু হোল মাতৃভূমি বিপন্ন, মাতৃভূমি রক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করো। বৃটিশ অধিকৃত বিভিন্ন অঞ্চলে দেশ-প্রেমিক সভা (Patriotic meeting) অনুষ্ঠিত হোল।

১৭৯৮ খৃস্টাব্দে জুন মাসে কলকাতায় ফ্রান্স-বৃটেন যুদ্ধ নিয়ে বৃটিশ নাগরিক-দের এক সভা আহূত হোল ; সেই সভায় একটি কমিটি গঠিত হোল। কমিটির কাজ হোল চাঁদা সংগ্রহ করা। সভায় স্পষ্টভাষায় বলা হোল, ভারতে বৃটিশ অধিকৃত ভূভাগসমূহের ভবিষ্যৎ ইংলণ্ডের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত।[৭] সভায় শপথ নেওয়া হোল – আমাদের শত্রুরা ফ্রান্সে বসে যে স্বপ্ন দেখছে, যেভাবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিপদ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দিচ্ছে, তাকে প্রতিহত করতে হবে।[৮]

এই জাতের দেশপ্রেমিক সভা ভারতের নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হোল—মুর্শিদাবাদে, মাদ্রাজে, বোম্বাইয়ে, ফতেগড়ে, আলিগড়ে আরও অনেক সেনা-নিবাসে কলকাতার সভায় কোম্পানীর এডভোকেট জেনারেল মিঃ বারোজ (Burroughs) বললেন, এতদিনে স্বৈরতন্ত্রী ভণ্ড দার্শনিকদের মুখোশ খসে পড়ল। ওরা নিজেদের হতভাগ্য দেশকে ধ্বংস ও হত্যার প্লাবনে ভাসিয়ে দিয়েছে।[৯]

যুদ্ধের অবস্থা খুব অনুকূল থাকছিল না ; তাই আতঙ্কও বাড়ছিল। ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে কলকাতায় আর একটি সভা আহূত হোল। মহামান্য শেরিফ সভাপতিত্ব করলেন। সভা থেকে গভর্ণর জেনারেলের কাছে একটি বার্তা পাঠান হোল। বলা হোল, মাতৃভূমি আজ বিপন্ন ; স্বদেশের নিরাপত্তার সঙ্গে আমাদের সম্মান ও অস্তিত্ব আচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। মজার কথা হচ্ছে, এই সব সভায় দেশীয়রা নিমন্ত্রিত হতেন। তাঁরা বক্তৃতা দিতেন না, শুধু চাঁদা দিতেন। সুদূর ইউরোপে যুদ্ধ চলছে, তার জন্য কলকাতার নিরাপত্তা কেন

বিঘ্নিত হচ্ছিল, তা সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না। তবু যেসব দেশ বৃটেনের সঙ্গে যুদ্ধে নিরত, সেসব দেশের নাগরিকদের নাম রেজিস্ট্রীভুক্ত করার জন্য হুকুম দেওয়া হোল ; এবং নির্দেশ হোল, এরা কেউ যেন কলকাতার সীমানা ত্যাগ না করে।[১০]

যুদ্ধ চলছে ইউরোপে ; কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রতাপ দেখাতে বাধা কোথায়! কয়েকটি মামুলি ডিঙি নৌকা আটক করে ফরাসীদের জব্বর শিক্ষা দেওয়া হোল। এবং প্রবন্ধিব অসাধারণ বীরত্বের জন্য কলকাতার কয়েকটি ইংরেজ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর মালিকেরা এক কমিটি গঠন করে ফেলল ক্যাপটেন হার্ডিম্যানকে সম্বর্দ্ধিত করার জন্য। তাকে একটি সুন্দর (elegant) তরবারি উপহার দিল। ফরাসী অর্ণবপোত Laforte দখল করার সময় তিনি বহুত কেরামতি দেখিয়েছেন। হার্ডিম্যান একা নন, পুরস্কার আরও বহুজন পেলেন। বৃটিশ জাহাজ 'আর্মেনিয়া' আর ফরাসী জাহাজ 'লা ক্লাবিফার' এর মধ্যে একটি মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ; তার ফলে ফকনার নামে এক জাহাজী ঘায়েল হয়। মৃতের জননীকে ১৫০১ টাকা দেওয়া হোল। এ ছাড়া লা চাঁওপুর, লা ইউজিন, লা হিরানডেল তিনটি ফরাসী ফ্রিগেট দখল করার জন্য বিভিন্ন লস্করকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়।[১১]

পুরস্কারদাতারা এই সব অর্থ দেশ থেকে সঙ্গে করে আনেননি ; কাজেই দিতে কোন কষ্ট হবার কথা নয়। ১৮০২ খৃস্টাব্দে ইউরোপে যুদ্ধাবসান ঘটল ; ভারতের বুকেও সংঘর্ষের যবনিকাপাত হোল। ২রা সেপ্টেম্বর ইউরোপে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হোল ; ১লা ডিসেম্বর কলকাতায় বিজয়োৎসব উদযাপিত হোল।[১২]

এই ফাঁকে আমরা আর একটি গল্প বলে নিই। বিলেতের কর্তারা নেপো-লিয়নের অগ্রগতি রুখবার জন্য বড়লাট ওয়েলেসলিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন আফগানিস্থানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ; কিন্তু ওয়েলেসলি ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য টিপু সুলতানকেই বেছে নিলেন। টিপু সুলতানের 'অপরাধ' ছিল বহুবিধ ; প্রথমত, টিপুর বাহিনীতে কিছু ফরাসী সৈন্য ছিল। তারা দেশের বিপ্লবের চমকপ্রদ গল্প টিপুকে শোনাত। দ্বিতীয়ত, ১৭৯৭ সালে মাঙ্গালোরে এক জাহাজ ডুবি হোল। সেই জাহাজে রিপো (Ripaud) নামে এক মহা চালবাজ লোক ছিল ; টিপুর কাছে প্রেরিত ফ্রান্সের সরকারী দূত বগেল সে নিজেকে হাজির করল। টিপু তাকে মহাসমারোহে গ্রহণ করলেন। এই রিপো উদ্যোগী

হয়ে শ্রীরঙ্গপত্তমে জ্যাকোবিন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করল ; ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়িয়ে দিল। টিপুর অধীনস্থ ফরাসী বাহিনী এইসব উত্তেজক ঘটনায় খুবই উৎসাহিত হোল ; তারা মিছিল করে গিয়ে টিপুকে Citizan টিপু বলে সম্বোধন করল। প্রজাতন্ত্র তরু (Republican Tree) শ্রীরঙ্গপত্তমে বোনা হোল। এবং ঐ প্রতারকের উদ্যোগে টিপুর কাছ থেকে এক দৌত্য ফ্রান্সে গিয়ে উপনীত হোল। টিপুর কোনো উপকার হোল না এতে। বরং ওয়েলেসলির সন্দেহ বাড়িয়ে দেওয়া হোল। পাছে জলপথে কোনো সাহায্য আসে, তাই ইংরেজবাহিনী এগিয়ে এসে পর্তুগীজ গোয়া দখল করল। এবং ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী ওয়েলেসলি টিপুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। টিপুর পক্ষে ফ্রান্সের কেউ কড়ে আঙ্গুলটিও উঁচু করল না। টিপু পরাজিত ও নিহত হলেন। তাঁর নাবালক সন্তানদের কলকাতায় বন্দী করে আনা হোলো। আরও বিপুল সমারোহের সঙ্গে দেশীয়-দের অর্থে যুদ্ধ জয়ের উৎসব কলকাতায় পালিত হোল এবং ৮ই জুন খবরের কাগজে একটি বিজ্ঞপ্তি ছাপা হোল এই মর্মে—

The Magistrate of Calcutta has invited the inhabitants of Calcutta to illuminate the houses on the 8th proximo, being the day for grand entertainment, in celebration of the Glorious Victory of the Alies at Waterloo।[১৩] টিপু সুলতানের দরবার কক্ষে যে কার্পেট বিছানো থাকত, সেই লুঠ করে-আনা কার্পেট বিছিয়ে, তারই ওপর সিংহাসন বসিয়ে, বড়লাট দরবার করলেন। লক্ষ্ণৌ ও মুর্শিদাবাদ থেকে বাঈজী প্রস্তুতকারক আনা হোল। তারা বাঈজী পুড়িয়ে জমকালো রোশনাই করল। (১৩ক) লাটভবনে যুদ্ধ বিজয়ী সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটনের ছবি প্রদর্শিত হোল। ওয়াটারলুর যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে চাঁদা আদায় শুরু হোল বিভিন্ন শহরে—কলকাতায়, বোম্বাই ও মাদ্রাজে। বরোদার গাইকোয়ার চাঁদা দিলেন মোটা অঙ্কে। ঢাকার নবাব নসরত জং ঢাকাবাসীদের এই উপলক্ষে এক বিরাট ভোজে আপ্যায়িত করেন।[১৪]

তিন

বৃটেনে জ্যাকোবিনবাদ অর্থে বোঝাত দেশদ্রোহিতা ও ধর্মদ্রোহিতা। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জি, এম, ট্রিভেলিয়ান লিখেছেন, জ্যাকোবিনবাদ বিরোধিতা

আর খৃস্টীয় ধর্মযাজকদের ধর্ম প্রবণতা তখন একত্রীভূত হয়েছিল।[১৫] কলকাতায় তাই জ্যাকোবিনবাদ পরম ভীতির ব্যাপার হয়ে উঠল। টিপু বিজয়ী লর্ড ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করলেন। নতুন যেসব কাডেট কলকাতায় আসছিল, তাদের মস্তিষ্ক ছিল ইউরোপের নতুন নতুন মতবাদে পরিপুরিত। মস্তক থেকে এইসব মতবাদ ঝেটিয়ে বিদায় করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হোল। কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে সরকারী দলিলে বলা হয়—

"It cannot be denied that during the convulsions with which doctrines of the French Revolution have agitated the continent of Europe, erroneous principles of the same dengerous tendency had reached the minds of some individuals in the civil and military services of the company"[১৬]

এই পর্যন্ত বলেও তার তৃপ্ত হননি ; আরও পরিস্কার করে বলব —

"To fix and establish sound and correct principles of religion and government in their minds at an early period of life was in the best security which could be provided for the stability of the British power in India"[১৭]

জানিনা, সাম্রাজ্যবাদী শাসকের এর থেকে স্পষ্টতর আর কি বলার থাকতে পারে। আর দুই বাংলায় রেনেসাঁস পণ্ডিত নামে খ্যাত এক বিদেশী লিখছেন, "less known in the fact that Wellesley was also responsible for a cultural revolution in India no less significant than political one"[১৮]

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 'Cultural Revolution' প্রতিহত করার জন্যই। কিন্তু সৃষ্টির চলা-ফেরা স্রষ্টার অভিপ্রায়ে নিয়ন্ত্রিত হয় না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজও ওয়েলেসলির ইচ্ছা অনুযায়ী চলেনি ; তাই ডক্টর ডিনউইডির মতে গণিতশাস্ত্রী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানবিদ এখানে অধ্যাপনা করেছেন[১৯] যদিও বেছে বেছে মিশনারীদেরই অধ্যাপক রূপে আনা হোল ; কিন্তু যে সব বই প্রকাশিত হোল, তার প্রায় সবগুলিই 'সেকুলার' বা ধর্মনিরপেক্ষ।

চার

Liberte, Equalite, Fraternite—ফরাসী বিপ্লবের এই তিনটি রণধ্বনি বারবার ফুঁসে-ফুঁসে উঠেছে। রাজতন্ত্রের সামরিক অভ্যুত্থানেও এই মন্ত্রগুলির শক্তি বিনষ্ট হয়নি।

আমেরিকার মুক্তি যুদ্ধ ও ফ্রান্সের বিপ্লব উপনিবেশের পরাধীন মানুষকে মুক্তির স্বপ্ন দেখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৮২০ খৃস্টাব্দে স্পেনে বিপ্লব সংঘটিত হোল ; সে খবর ভারতবর্ষে পৌছোলে রামমোহন আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। আবার ১৮২১ খৃস্টাব্দে অস্ট্রীয় বাহিনী নেপলসবাসীর স্বাধীনতা হরণ করলে তিনি দুঃখবোধ করেছিলেন। তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন,' "Enemies of liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful."[২০] ফরাসী অধীনতা পাশ ছিন্ন করে লাটিন আমেরিকার কোনো কোনো দেশ স্বাধীন হলে তিনি কলকাতার টাউন হলে এক ভোজসভার আয়োজন করেন—এই ভোজসভায় ষাটজন ইউরোপীয় আমন্ত্রিত হন। ১৮২২ খৃস্টাব্দে গ্রীস স্বাধীনতা ঘোষণা করল। ডেভিড ড্রামণ্ড ও তাঁর ধর্মতলা একাডেমীর ছাত্র হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিয়ো গ্রীসের মুক্তিযুদ্ধের ওপর কয়েকটি কবিতা লিখলেন। ১৮১৬ খৃস্টাব্দে রামমোহন রায় ভারতীয় প্রেক্ষাপটে নব চিন্তার প্রয়োগ ঘটালেন। এমন কি তাঁর এই নব্য ভাবনার পরিচয় খৃস্টীয় ধর্ম জিজ্ঞাসায়ও ফুটে উঠল তাঁর Precepts of Jesus Christ এবং Universal Religion বেকন-লক ও ফরাসী বিপ্লব প্রভাবিত।

"In matter of religion particulerly man in general through prejudice and partiality to the opinions which they once form, pay little or no attention to opposite sentiments (however reasonable they may be) and often turn a deaf ear to what is most consistant with the Laws of native and comfortable to the dictates of human reason and divine revolution." [২১]

একদিকে ফরাসী বিপ্লবের শিক্ষা আত্মস্থ করার উদ্যোগ, অপর দিকে শাসকশ্রেণী তার শক্তি ও পরাক্রমের খবর প্রচারে তৎপর। ১৮২৬ খৃস্টাব্দে

২৫শে জানুয়ারী কলকাতায় পরম উৎসাহ ভরে ওয়াটারলুর যুদ্ধের চিত্রাবলীর এক প্রদর্শনী হোল।[২২]

এই বৎসরই একটা খবর দেশে উত্তেজনা সৃষ্টি করল—সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে বন্দী নেপোলিয়ানের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে তাই খবরটি প্রকাশ হয়ে গেল। মাদ্রাজে এক পত্রিকায় এই খবর প্রথম প্রকাশিত হয়।[২৩] এবং এই খবর প্রকাশনার অপরাধে ঐ পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ হোল। এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উঠেছিল ; সব থেকে বেশি মুখর হয়েছিলেন কর্ণেল স্ট্যানহোপ। উনিশ শতকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নের সঙ্গে স্ট্যানহোপের নাম জড়িত। কলকাতায় তাঁর নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। এই ছাপাখানা থেকে মধুসূদন দত্তের অধিকাংশ বই ছাপা হয়।

পাঁচ

ইংরেজী ভাষা বুঝতে পারতেন, এবং বলতে পারতেন, এমন ব্যক্তিও কলকাতায় কিছু ছিলেন। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তি যথার্থ এঁরা নন। ১৮২১-২২ সাল থেকে এই শিক্ষিত সমাজ দেখা দিতে থাকে। এঁরা প্রথমে ডেভিড ড্রামণ্ড পরিচালিত ধর্মতলা একাডেমীতে শিক্ষালাভ করেন ; হরিদাস বসু, কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, কৈলাসচন্দ্র দত্ত সে-যুগের শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ; এঁরা ড্রামণ্ড বিদ্যালয়ের ছাত্র।

১ ২৬ সাল থেকে নব্য শিক্ষার দ্বিতীয় স্তর শুরু হয়। ঐ বৎসর মে মাসে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও হিন্দু কলেজে যোগ দেন।

ক্যালকাটা জার্নালে (Calcutta Journal) প্রকাশিত এক নিবন্ধে আলোচিত হোল জেমস মিলের উপর ফরাসী দার্শনিক রুশো ভলটেয়ার কাণ্ডেরে (Condorcet) প্রভৃতির প্রভাব কতটা পড়েছিল। ঐ নিবন্ধকার বললেন, মিল তাঁর ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখতে গিয়ে ফরাসীর নয়, খৃস্টীয় ধর্মযাজকদের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হয়েছিলেন। মিল তাঁর গ্রন্থে খৃস্টীয় মিশনারী ওয়ার্ড (Ward), ডুবই (Dubois) প্রভৃতির রচনার সহায়তা বেশি নিলেন ; স্যার উইলিয়ম জেনেসের লেখার নয়। জাতিবিদ্বেষ ছিল এঁদের মূলধন, বিশ্বমানবিকতা নয়। এই বইএর এক চমৎকার সমালোচনা লিখলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ। গল ও স্পারজিমের (Gull & Spurzheim) জঘন্য মানবদ্বেষী মতবাদ প্রচারের চেষ্টা চলছিল। ডা. পেটারসন (Paterson)

নামে এক ভদ্রলোক এশিয়াটিক সোসাইটিতে ফ্রেনোলজি বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। প্রথম প্রথম রামমোহন ভেবেছিলেন, হয়ত এর পিছনে কিছু বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে, পরে তাঁর মোহমুক্তি ঘটল। ডেভিড ড্রামণ্ড এই মতবাদের অনিষ্টকারিতা ব্যাখ্যা করে এক পুস্তিকা রচনা করলেন।

ড্রামণ্ড-শিষ্য ডিরোজিওর নেতৃত্বে কলকাতায় আলোচনা সভা প্রতিষ্ঠিত হোল অবশ্য রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা' প্রথম সভা। তবে ডিরোজিওর নেতৃত্বে যুবকেরা এগিয়ে এলেন।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও কুসংস্কার বিরোধিতা ফরাসী দার্শনিকদের প্রধান কাজ।

সে সময়ে কলকাতায় ফরাসী বিলাস উপকরণ প্রচুর পাওয়া যেত। তবে ফরাসী মদ, বা ফরাসী প্রমোদ নাচ ছেলেদের কতটা প্রিয় ছিল, তা আমরা বলতে পারব না। কিন্তু ফরাসী বই, অনুবাদসহ, কলকাতায় প্রচুর পাওয়া যেত; তার বিজ্ঞাপনও ছাপা হোত।[২৩] এমন কি, ফরাসী আইন ও বৃটিশ আইনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা সমৃদ্ধ গ্রন্থ কলকাতায় পাওয়া যেত।[২৪]

ফরাসী ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক তখন কলকাতার ছাত্রসমাজে অতীব জনপ্রিয়। রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ তাঁর স্মৃতি-কথায় লিখছেন, "And more than once my ears were greeted with the sound of scotch rhymes from the poems of Robert Burns" শুধু বার্ণস নন, টমাস ক্যামপবেল; কাউপার, ব্লেক ছাত্রদের কাছে ফরাসী বিপ্লবাদর্শ সমর্থনের জন্য সমাদর পেতেন।

বার্ণস ফরাসী বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন,

It 's coming yet for a' that;
That man to man, the world o'er
Shall brithers be for a' that.

ব্লেক সর্বদা ফরাসী বিপ্লবীদের টুপি—লাল টুপি পরে ঘুরতেন। কাউপার লিখলেন :

A thing for poetry divine
A thing to enable even mine,
In memorable eighty nine.

ক্যামলবেলের 'Pleasures of Hope' ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাতে মানব মুক্তির স্বপ্ন ছিল; আর ছিল ভারতবাসীর মুক্তির স্বপ্ন। এ কবিতা

ডিরোজিয়োর অতীব প্রিয় কবিতা; মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়েও প্রিয় ছাত্রের মুখে এই কবিতার অংশ বিশেষের আবৃত্তি শুনেছিলেন।

ছয়

১৮৩০ সালে ১৮ ডিসেম্বর সমাচার দর্পণে একটি খবর ছাপা হয়। আমরা উদ্ধৃত করছি।

"কলিকাতায় ভোজ। গত ১০ ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় উপস্থিত ফ্রান্সীয় সাহেবের ফ্রান্সদেশে সম্প্রতি যে রাজপরিবর্তন হইয়াছে তাহাতে সম্ভ্রমার্থে স্বীয় ২ মিত্রদিগকে টৌন হালেতে আহ্বান করিয়া ভোজন করাইলেন। ঐ ভোজনালয়ে দুই শত সাহেব একত্র হইয়া সেই মহাকীর্ত্তিতে যেরূপ উত্তেজনা জন্মে সেই উত্তেজনাতে পরিপূর্ণ হইয়া ভোজন করিতে লাগিলেন।" এই খবরটির একটি ইংরেজী ভাষ্যও পাচ্ছি—

"On the 10th December 1830 a grand banquet was given by the commanders of the French Vessels in Bengal in the Town Hall. Two hundred persons attended it."[২৫]

কিন্তু খবর এইটুকু মাত্র নয়। ফরাসী বিপ্লবীদের পতাকার রঙ কলকাতার বঙ্গ সমাজের মন হরণ করেছিল।

"So great a favourite is the Tri-colour at Calcutta that we find it in the John Bull that on the Christmas-Day, it was hoisted along with the English on the Fop of Sir David Ochterlony's monument."[২৬]

জন বুলের মূল খবরটি এই—

"Fancy Ball and Supper in honours of late Revolution in in France observed in Calcutta on December 10 at Town Hall, a deep-felt admiration for those who fought, not France, but for the world, who gained the rights, not of France alone, but of Man.

"About 200 people assembled and spoke of freedom and humanity. Flags of America, Sweden, England, France decorated the walls of Town Hall." [২৭]

আমেরিকা, ও ইংলণ্ডের পতাকা কেমন করে এল, তা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু সুইডেনের পতাকা কেন সংযুক্ত হোল, তা আজ বোঝবার উপায় নেই।

কলকাতা থেকে রামমোহন রায় এই জুলাই বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠালেন।

রামমোহনের এই উৎসাহ সাময়িক উৎসাহ নয়। ইংলণ্ড যাবার পথে কেপটাউনে দুইটি ফরাসী জাহাজে বিপ্লবের পতাকা উড্ডীন দেখে তিনি অভিবাদন জানিয়ে ছিলেন। তখন পড়ে গিয়ে তাঁর পদদ্বয় অশক্ত ছিল, তবু তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফরাসী জাহাজে উঠে নাবিকদের সঙ্গে করমর্দন করে এসেছিলেন। ফ্রান্সের মানব-মুক্তির প্রয়াস কোন সময় তাঁর মনোযোগ হারায়নি। ১৮৩২ সালে ফ্রান্সের পাশপোর্টের জন্য যখন তিনি আবেদন করেছিলেন তখন তিনি লিখেছিলেন। "I am a traveller and that my heart is with the French people in their endeavour to support the cause of their liberal principles."

রামমোহন এক্ষেত্রে একা নন, ডিরোজিয়োর শিষ্যদল একই রকম উৎসাহের সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে প্রাণমন সমর্পণ করেছিল।

ডাফ সাহেব হিন্দু কলেজের ছাত্রদের আচার ব্যবহারে খুশি হতে পারেননি। ছাত্ররা যে টম পেইনের বই পড়েছে, তার জন্য আমেরিকার এক প্রকাশককে দায়ী করেছেন।[২৮]

বিশপ করি লিখেছেন ডিরোজিয়োর কাছে ছেলেরা এই বইয়ের খবর জানতে পারে। হিন্দু কলেজের শিক্ষার বিরুদ্ধে তিনি লিখলেন—

"The Hindu College was breeding up a race of Infidels and Philosophers so called. They seem to hate Chirstanity and England heartily." [২৯]

ডাফ সাহেব ডিরোজিয়োর প্রতিষ্ঠিত একাডেমিক এসোসিয়েশনের বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন। একটি অধিবেশনের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনার সময় তিনি—

"When discoveries in Science and Government happen to come up, France is eulogised unboundedly ; not England. If refferred to, always depreciated." এবং তৎসহ আরও একটি বাক্য

যোগ করছেন—"Thus our Rulers are preparing a scourge for their own backs." [৩০]

বিশপ করি তাঁর স্মৃতি-চারণে বলছেন, গত সপ্তাহে মিস বি (মিস বেন্টিক —বেন্টিক ভগিনী) হিন্দু কলেজ দেখতে যান। একটি উঁচু ক্লাসে ঢুকে তিনি আমেরিকার শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করে অবাক হয়েছিলেন। ছেলেরা বলল, একদিন তার আমেরিকার পথ অনুসরণ করবে।[৩১]

মনুমেন্টের শীর্ষে ফরাসী বিপ্লবের পতাকা হিন্দু কলেজের ছাত্ররাই উড়িয়ে দিয়েছিল।

বৎসর চোদ্দ কেটে গেল। ডিরোজিয়োর মৃত্যুও কয় বৎসর পূর্বে ঘটেছে। 'বেঙ্গল হরকরা'র (Bengal Hurkaru) 'An old Hindoo' নাম দিয়ে এক চিঠি বের হোল। পত্রলেখক তাতে পুরোনা দিন, ডিরোজিয়োর শিক্ষক-তাকালের স্মৃতিচারণ করছিলেন। ঐ চিঠিতে লিখলেন, হিন্দু কলেজের ছেলেরা নতুন চিন্তাভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ; আধুনিক দার্শনিকদের লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। এতে তাদের বুদ্ধির জড়তা কেটে গেছে। এই চিঠি পড়ে মিশনারী পরিচালিত পত্রিকা 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' খুব খেপে গেল—

"To assert that the Natives had enjoyed the blessings of the French Revolution ; they would by this time have been treated like men, and assumed a proper position among the nations of the earth is to write absolute nonsense. Let him read Thiers and Allison before he again ventures to long for a revolution which would have turned the Hooghly into a revolutionary torrent, and established a permanent of guillotine in Tank Square." [৩২]

এই সময়ে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা 'ইয়ং বেঙ্গল'দের উদ্যোগে গঠিত হয়েছে। ঐ সভার এক অধিবেশনে 'ইতিহাস' বিষয়ে এক বক্তৃতায় কৃষ্ণমোহন বললেন, "While the just rights of humanity and dispositions of kings and nobles to neglect the comfort of the poor, demand the greatest majority of citizens, ought not to be altogether without a voice in the Government of their

country." এই বক্তব্যের ইন্ধন কোন ঘটনা জুগিয়েছে, তা বুঝতে উল্লেখ কষ্ট হয় না। কৃষ্ণমোহন চতুর্দশ লুইয়ের পতন করেছেন। বিশেষ দেশের একটি বিশেষ ঘটনা থেকে কৃষ্ণমোহন একটি সাধারণ সত্যে এসে উপনীত হলেন—"The inflated pride and insolence which undue elevation has given to many a vicious king, warns a persons against seeking an absolute monarchy too earnestly."[৩৩]

তবে বিপ্লবকে সমর্থন করেও বিপ্লবের আদর্শে সব সময় সবাই বশংবদ থাকতে পারেননি, বিশেষ করে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে বিপ্লবের সমর্থকেরাও ইংলণ্ডের পক্ষে গিয়ে দাঁড়ালেন ; নিরপেক্ষ থাকতে পারলেন না।

১৮৪৩ সালে ২৮শে নভেম্বর ডেভিড ড্রামণ্ড ইংলণ্ডের জয়ে আনন্দ প্রকাশ করে একটি কবিতা লিখলেন।[৩৪]

Wafting the hallowed strain on every wind.
Glory to God, deliverence for Mankind.

জাতীয়তাবাদী ভাবনাচিন্তা তখন অধিকতর শক্তিশালী ছিল। এখনই কম ?

পাদটীকা

১. Memoir's of Hicky—(1790—1825) vol. 1V, Second Edition 1025, P. 43.
২. Calcutta Gazette, 16 June, 1791.
৩. Calcutta Gazett. 16—20 June, 1791.
৪. La-Revolution et les Establishments Francais dans l 'Inde—Cabernadie P 24-30.
৫. ঐ।
৬. Asiatic Annual Register, 1799.
৭. ঐ—Oct, 1799 পৃষ্ঠা—৩৭।

৮. ঐ।
৯. Bengal Chronicle, 1800.
১০. Calcutta Gazette, May 22, 1800.
১১. Asiatic Annual Register, September 4, 1801.
১২. ঐ, 1802, December.
১৩. Asiatic Journal, 8 June, 1816.
১৩ক. ঐ
১৪. ঐ
১৫. British History in the Nineteenth Century. and After—(1782—1819—G. M. Trevelyan. 194 P. P. 161.
১৬. Minute on the Foundation of College at Fart William, July 10, 1800. W. H. Allen. London. 1832 Vol. II. P. 342.
১৭. ঐ
১৮. Bengal Renaissance and Orientalism—David Kohf. P. 45.
১৯. To James Silk Buckinham—a letter by Rammohan Roy., Dated 1 August, 1821.
২০. Edinburgh Review, September, 1823.
২১. Introduction—The Precepts of Jesus Christ.
২২. Bengal Hurkaru, 25 January, 1826.
২৩. Calcutta Journal, 13 March, 1826.
২৪. Bengal Hurkaru, Jan—March, 1828.
২৫. John Bull, 18 December, 1830.
২৬. Asiatic Journal, January, 1831.
২৭. John Bull, 18 December, 1830.
২৮. India and India Missions—Rev. Alexander Duff. Appendix.
২৯. Memoirs of Bishop Corrie—April 30, 1831.

৩০. India & India Missions—Dulf.
৩১. Memoirs or Bishop Corric—P. 481.
৩২. friend of India, 16 March, 1843.
৩৩. Proceedings of the Society for the Acquisition of General Knowledge—Gautam Chatterjee,
৩৪. Weekly Examiner—28 November, 1843.

আলোচনা

ব্যাকরণসূত্রের পরিধি

শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

[গত সংখ্যায় সাহিত্য সংসদ্ প্রকাশিত বাঙ্গলা অভিধান নিয়ে আলোচনা করেছিলেন শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ, তারই সংযোজন এই রচনা। —সম্পাদক।]

'বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা'। কবির এই উক্তির মধ্যে নিহিত রয়েছে কবির এক বিশ্বাস—মানুষের বৃদ্ধত্ব-বিকাশে দরকার হয় তার জরার প্রকাশ। দুর্ভাগ্যক্রমে জরায় জর্জর এই লেখকের সপ্তাশীতি পূর্ণ হলেও বৃদ্ধত্বের চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না, এসে গেছে ঘণীভূত জড়ত্ব। এই অবস্থাতেই, কিছু দিন আগে 'বিভাব' ত্রৈমাসিকের ১৩৯১-শরৎকালীন সংখ্যায় দিয়েছিলাম একটি লেখা—ভেবেছিলাম এই লেখাই এ জীবনের শেষ রচনা। অলক্ষ্যে বিধাতা-পুরুষ হেসেছিলেন। সেদিন নিতান্ত অনিচ্ছায় উপরোধে ঢেঁকি গিলতে হয়েছিল। আজ নিজেরই একান্ত গরজে 'বিভাব'-সম্পাদকমহাশয়ের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস—দৃষ্টিহারা, স্মৃতিহারা, সংবিৎহারা হলেও আত্ম-প্রকাশ না করে উপায় নেই। পূর্বোক্ত লেখাটিতে 'সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান' সম্বন্ধে আলোচনা ছিল। অভিধানের কয়েকটি শব্দ নিয়ে সংশয় ছিল। ৯-নং সংশয়ে (বিভাব, পৃ, ৭০) লিখেছিলাম—

'নিরুদ্বিগ্ন, নিরুদ্দিষ্ট, নিরবচ্ছিন্ন, নিরাসক্ত, নিরলস' প্রভৃতি সংস্কৃত-ব্যাকরণদুষ্ট কতকগুলি শব্দকে খাঁটি সংস্কৃত বলে এই অভিধান স্বীকার করেছে। তা যদি হয় তা হলে অভিধান দেখে শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

লেখাটি ছাপা হলে সংস্কৃত ব্যাকরণে পণ্ডিত আমার এক বন্ধু এসে বললেন—

'নিরলস' শব্দ ব্যাকরণদুষ্ট ঠিকই, কিন্তু অন্য শব্দগুলি ব্যাকরণসম্মত। ক্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণ বটে, তবে ক্লীবলিঙ্গ বিশেষ্যও। অতএব এই শব্দগুলি বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত।

চমকে উঠলাম। এই শব্দগুলিকে চিরকাল ব্যাকরণ-বিরোধী বলে জেনে এসেছি। ছাপার অক্ষরে বিদ্যা জাহির করবার আগে পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-ও ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। হরিচরণের মতামত সর্বত্র অভ্রান্ত এমন কথা নিশ্চয়ই বলছি না। তবে তাঁর বৈদগ্ধ্য, অনুসন্ধিৎসা, আন্তরিকতা অবিসংবাদিত। 'নিরুদ্দিষ্ট, নিরুদ্বিগ্ন' প্রভৃতি শব্দকে হরিচরণ শুদ্ধ সংস্কৃত বলে স্বীকার করেন নি। এই শব্দগুলিকে তিনি 'বিণ' (সংস্কৃত বিশেষণ) বলে চিহ্নিত করেন নি, বলেছেন 'বিং' (বাংলা বিশ্লেষণ)।

বিশেষ্য-রূপে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দের পরিধি কতটা পরিব্যাপ্ত জানি না। 'নিরুদ্দিষ্ট, নিরুদ্বিগ্ন' বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত হলে 'নিরুদ্যত, নীরুগণ, নির্দুষ্ট, নির্নুদ্ধ, নির্ভীত, নির্বিশিষ্ট, নির্বিরুদ্ধ, নিশ্চিন্তিত, নিশ্চিহ্নিত, নির্লজ্জিত' শব্দগুলিও বহুব্রীহি সমাসে সিদ্ধ হবে কিনা জানতে চাই।

বৈয়াকরণেরা এ বিষয়ে আলোকপাত করলে অনুগৃহীত হব।

কবিতাগুচ্ছ

শঙ্খ ঘোষের কবিতা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

অনেকদিন শঙ্খ ঘোষ কিছু লেখেননি। বাঙালী পাঠকের কাছে তাঁর অনুপস্থিতি প্রায় অস্বস্থির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান ও প্রিয় এই কবি মধ্যে দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। আমাদের গর্ব সুস্থ হবার পর 'বিভাবে'র জন্য প্রথম তিনটি কবিতা আমরা পেয়েছি। প্রেসের কারণে এ সংখ্যার প্রকাশ বিলম্বিত না হলে বিভাবেই তাঁর নতুন পর্যায়ের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হতো। আসলে একসঙ্গে সাতটি কবিতাই আমরা পেতাম যদিনা, আমাদের প্রধান সহকারীর অসুস্থতার কারণে তা সংগ্রহ করতে আমাদের দেরি হয়ে যেতো। কবিতা তিনটির সঙ্গে শঙ্খদা আমাকে যে চিঠি দেন তা নিম্নরূপ।

শ্রী

16 ডিসেম্বর 1984

প্রীতিভাজনেষু,

লিখেছিলাম কয়েকটি, তার মধ্যে গুটি চারেক হাতছাড়া হয়ে গেল কদিন আগে। তিনটি টুকরো পাঠাচ্ছি, যদিও খুব অনিচ্ছায়।

লিখে মনে হচ্ছে না এ কোনো লেখা হচ্ছে। একেবারে চুপ করে গেলেই বোধহয় ভালো ছিল, কিন্তু এই ভাবেই আমরা চাকায় ঘুরতে থাকি।

ভালো হয়ে উঠছি, কেবল গলার সমস্যাটি বড়ো-একটা কমছে না। আরো কিছু দিনের আলস্য বোধ হয় কপালে আছে। আপনার খবর ভালো তো?

শঙ্খ ঘোষের কবিতার ব্যাপক আলোচনা ইতিপূর্বে অনেক হয়েছে বিভাবেও হয়েছে। যে যোগ্যতা থাকলে আরো নতুন কিছু সূত্র নির্দেশ করা যায়, সম্ভবত, সে যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু যে কারণে ওপরের চিঠিটা উদ্ধৃত হলো তার "লিখে মনে হচ্ছে না এ কোনো লেখা হচ্ছে। একেবারে চুপ করে গেলেই বোধহয় ভালো ছিল" অংশটুকু সম্পর্কে আমার কিছু বিপরীত বক্তব্য গড়ে উঠেছে কবিতা তিনটি পড়বার পর।

কবিরা অনেক সময়ই তাদের লেখার সঠিক গুরুত্ব বুঝে উঠতে পারেন না। পৃথিবীর যে কোনো সার্থক কবির ক্ষেত্রেই এ তথ্য সত্য। আমার নিজের এ কবিতা তিনটি অসম্ভব ভাল লেগেছে জানালে বিষয়টি সহজ শোনাতো। কিন্তু শঙ্খ ঘোষের ভাষায়ই বলি "সহজ কথা বলা তেমন সহজ নয়", অন্তত এই তিনটি কবিতা সম্পর্কে। আমরা জানি শঙ্খ ঘোষের কবিতা পড়তে হলে, দুলাইনের মধ্যবর্তী গভীরতর ইঙ্গিত ব্যঞ্জনাও আবিষ্কার করতে জানতে হয়। আপাত-মিতকথন ও সংযত কণ্ঠের যে ব্যাপক দ্যোতনা তার বৈশিষ্ট, এই কবিতাগুলো তার চেয়েও পরিমিতিসম্পন্ন ইঙ্গিতপ্রধান ও গভীর। শুধু পড়ে গেলেই হবে না প্রতিটি মুহূর্ত পাঠককে অত্যন্ত সজাগ ও মনস্ক থাকতে হবে। পড়তে হবে একাধিকবার। কিছু ইংগিত "হাতুড়ির ঘা পড়ছে পেতলে। আর চোখের সামনে জমে উঠছে স্তূপাকার সরপুঁটি…" বা কিছুটা তাঁর প্রাক্তন তির্যক প্রকাশভঙ্গি "নাচগান চলছেই চারদিকে / মাঝে মাঝে হিজড়েরাও কোমর বাঁকিয়ে চলে যায়" এবং "কতরকম কাঁকড়াবিছে, তোরণ / আর অন্ধিসন্ধি" তবু এরই ভিতর "কথা হলো, তুমি ঠিক কেমনভাবে / তোমার মতো হবে।" লক্ষণীয় এখানে বিদ্রুপ ক্রমশই ভিতরে নিজের দিকে গেছে। সব কিছু—অযোগ্যের কোমর বাঁকানো, পরশ্রীকাতরতা, অন্ধিসন্ধি রয়েছে থাকবে। এর মধ্যে নিজেকে বিমুক্ত রাখা, ব্যাসে স্থিত রাখার উপায় "পোশাক" কবিতার এই অন্বেষাই আমাদের ভাবায়, সম্ভবত ভীত এবং শেষত ভীতও করে।

"মুখ" কবিতাটিই আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। কবিতাটি বোঝার আকর্ষণ যতটা, না বোঝার আকর্ষণ ততটাই। চলনে কিছুটা বিবৃতি-ধর্মী হলেও, এ কবিতা কিন্তু প্রথমেই কিছু বলে দেয় না। আস্তে আস্তে ধরা দেয়। এই ধরা দেওয়ার আনন্দ এখনো আছে বলে কবিতাটিকে সেই বিশেষ পাঠকের হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি যারা নিজেরাও অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে কবি হয়ে উঠতে পারেন যদি এর আলিঙ্গনে শেষ অবধি পৌঁছোতে পারেন।

শঙ্খ ঘোষের তিনটি কবিতা

ধুলো

ঠিক আগে যেমন একবার হয়েছিল।
এমনি করেই ঘুরে যাব।

আবার ভুল করে ঢুকে পড়েছ
ওই শামিয়ানায়।

বাদাবন, সূর্যাস্ত, সোনালি ব্যাঙ
কাউকেই বেশি লাই দিতে নেই।

হাতুড়ির ঘা পড়ছে পিতলে
আর চোখের সামনে জমে উঠছে স্তূপাকার সরপুঁটি

ঠিক আগে যেমন হয়েছিল। কিন্তু এবারও কি
ধুলো লাগছে মুখে?

পোশাক

অনেকদিন হলো।
পরব না পরব না করেও পোশাক পরা হলো অনেকরকম।

ছেড়ে ফেলতে কোনো কষ্ট নেই তো?
তাহলেই হলো।

নাচগান চলছেই চারদিকে
মাঝে মাঝে হিজড়েরাও কোমর বাঁকিয়ে চলে যায়

কতরকম কাঁকড়াবিছে, তোরণ,
আর অন্ধিসন্ধি

কথা হলো, তুমি ঠিক কেমনভাবে
তোমার মতো হবে।

মুখ

মনে পড়ে সেই
না

সেই না-এর কোনো অর্থ নেই দর্প নেই
কোনো ভার নেই

আদুল ঘাস ছাড়িয়ে পাটল পাহাড় ছাড়িয়ে
গহ্বরের পর গহ্বর আর ধবল শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ ছাড়িয়ে

সেই
না

স্বাতীবিন্দু আর অরুন্ধতীর পাশ ছাড়ানো ঊর্ধ্বতনে যাওয়া
না

আরো দূরে, দূর কিংবা না-দূর যেখানে এক হয়ে আছে
কিংবা নেই

চরাচরহীন সেই না-এর বিরাম থেকে
নিযুত নিযুত কত আলোকবর্ষের পার থেকে

দেখি
দেখি ওই পরিশ্রমী মুখ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সাহিত্য অকাদেমির আলোচনাচক্র

তরুণ দে

[সম্প্রতি সাহিত্য অকাদেমির আয়োজনে 'স্বাধীনতা-উত্তর গ্রামজীবনের পরিবর্তন এবং কথাসাহিত্যে তার প্রতিফলন' : এই বিষয় নিয়ে হয়ে গেল একটি আলোচনাচক্র। তারই বিবরণ এই রচনায়—সম্পাদক]

নগরের পরিবর্তে অরণ্যকে ফিরে পেতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আধুনিক সভ্যতার টানা-পোড়েনে স্পষ্ট নগরের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় হয়তো-বা তিনি ক্লান্তি বোধ করছিলেন। উল্টোদিকে, ভারি অবাক লাগে যখন বাংলাদেশের সাহিত্য তার স্বাধীনতার সন্ধানে পাড়ি দেয় গ্রাম থেকে শহরে। নিশ্চিন্তপুরের অপু অবাকবিস্ময়ে দেখছিল শহরমুখী রেলগাড়ির ছুটে চলা। 'মহেশ' গল্পের গফুর-আমিনাকে গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল শহরে। বাংলার সাহিত্য-প্রেক্ষাপট থেকে তাকিয়ে দেখলে এই দুটি ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যময় মনে হয়।

সামাজিক জীবনে গ্রাম ও শহরের পারস্পরিক নির্ভরতা এবং তাদের মিলন-বিচ্ছেদের সুস্পষ্ট অভিঘাত পড়েছিল ওড়িয়া, মৈথিলি ও বাংলা সাহিত্যে। স্বাধীনতা-উত্তর এই অভিঘাতের বিশ্লেষণী ছবিটি তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছিল সাহিত্য অকাদেমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহায়তায় গত ১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৪ এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ভবনের ১০ সংখ্যক কক্ষে একটি আলোচনাসভা বসেছিল। দুই পর্বের আলোচনা সভার উদ্বোধন করে স্বাগত ভাষণ দেন অকাদেমির সচিব ইন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং

আলোচনার সূত্রপাত করেন অকাদেমির আঞ্চলিক শাখার সচিব শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

প্রথম পর্বের অধিবেশন শুরু হয় কৃষ্ণচন্দ্র ভুঁইঞার ওড়িয়া সাহিত্যে গ্রাম-জীবনের আলোচনা দিয়ে। কৃষ্ণচন্দ্র বলেন, ওড়িয়া সাহিত্যকে দুটি পর্বে বিভক্ত করেছে গান্ধীবাদে আস্থা ও অনাস্থা। পর্বভেদী কালরেখাটি হল ১৯৬০। তিনি বলেন কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, গোপীনাথ মহান্তি, চন্দ্রশেখর রথ, নরসিংহপ্রসাদ গুরু প্রমুখের উপন্যাসে বারংবার গ্রামজীবনের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। গোপীনাথ মহান্তির কৌতূহল ওড়িশার আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনযাপনে। বিষয়টির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অসীম। নিপীড়িত আদিবাসী ও হরিজনদের সংস্কার, আচারানুষ্ঠানের যথাযথ চিত্র তুলে ধরেছেন অন্যান্যরা। সন্দেহ নেই এই পর্বের সাহিত্যিকরা গান্ধীজী ও বিনোবাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়েছিলেন যথেষ্টই। এই পর্বের লেখকদের মধ্যে নীলমণি সাঁহু, বিভূতি পট্টনায়েক, কৃষ্ণপ্রসাদ মিশ্র, অদ্বৈতপ্রসাদ মহান্তি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ওড়িয়া উপন্যাসে শহর-জীবন গ্রাম-জীবনের দিকে প্রসারিত হয়েছে একথা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর আলোচনায় বলেছেন কিন্তু এই প্রসারের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া উহ্য থেকে যায়।

বৈবাহিক সমস্যা, সামাজিক-রাজনৈতিক জাগরণ, ব্যক্তিত্বের জাগরণ—মৈথিলি উপন্যাসে এই তিনটি হল মূল প্রসঙ্গ। মৈথিল উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইলারানী সিংহ এই কথা বলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করেন চতুরানন চৌধুরী, শৈলেন্দ্রমোহন ঝা, রাজকুমার চৌধুরী, ধীরেন্দ্র প্রমুখের নাম। রাজকুমার নরনারীর যৌন সম্পর্কের প্রসঙ্গটি সাহিত্যে টেনে এনে রীতিমত বিতর্কের সূচনা করেছিলেন। ধীরেন্দ্রের রচনায় পাওয়া যায় কৃষক জাগরণের কথা। শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলেছেন রামানন্দ রেণু। ইলারানী বলেন মৈথিল সমাজে নারী ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা আজও ঘটেনি।

গ্রামজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর ১৯৪৭ বাংলা গল্পে পাঁচটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সংশ্লিষ্ট বিষয়টির আলোচক উজ্জ্বলকুমার বলেন এই পাঁচটি প্রবণতা হল দেশভাগ ও তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া—মূল্যবোধের বিপর্যয়, জমির লড়াই, রাজনৈতিক সংঘর্ষ; সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিতে গ্রাম-বাংলার অবক্ষয়; নাগরিকতার প্রসার; গ্রামীণ ও নাগরিক মূল্যবোধের সংঘর্ষ এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রয়োজনে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন। এই

প্রবণতাগুলির দৃষ্টান্তরূপে তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, অসীম রায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখের নামোল্লেখ করেন। উজ্জ্বলবাবু বলেন, বামপন্থী লেখকদের অন্যতম বিষয় চাষীদের সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন। এর কারণ গ্রামীন অর্থনীতির মৌলিক অপরিবর্তন।

দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রথম আলোচক রবীন্দ্র গুপ্ত গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তনের কয়েকটি সূত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা না পাওয়ার বেদনাবোধ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু আগমন প্রভৃতি সামাজিক জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। তবে তা মধ্যবিত্ত সমাজেই বেশি। বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কৃষক সমাজেও সামাজিক চেতনা সম্প্রসারিত হয়েছে। সাবিত্রী রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ সান্যাল, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, তপোবিজয় ঘোষ প্রমুখের লেখায় এই সামাজিক পরিবর্তনগুলি চিত্রায়িত হতে দেখা যায়। সমাজের নীচুতলার মানুষের ভূমিকা প্রবল হয়ে ওঠার দিকে লক্ষ্য রেখেই গুণময় মান্নার উপন্যাসে তাঁদের নায়কোচিত ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে।

পবিত্র সরকার-এর সংক্ষিপ্ত, সংহত আলোচনায় দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ হয়। পবিত্রবাবু বলেন গ্রামের মানুষ মানসিকভাবে সরে আসছে নগরের অভিমুখে। গত পঁচিশ-ত্রিশ বছরে গ্রামগুলি অনেকাংশেই নগর হয়ে উঠেছে। সাহিত্যে এর প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে যেমন বিচ্ছিন্নতার কথা পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় জোট-বাঁধার সূত্র। গ্রামজীবনে প্রতিবাদ সংগঠিত করার চেতনা থেকেই উঠে এসেছে দ্বিতীয় সূত্রটি। মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী লেখকদের মধ্যে জোট-বাঁধার সূত্রটি লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। অরুণবাবু তাঁর সভাপতির আলোচনায় রমাপদ চৌধুরীর 'বনপলাশীর পদাবলী' উপন্যাসটির কথা উল্লেখ করে বলেন, উপন্যাসটি আলোচনার আদর্শ হতে পারত। তিনি সমগ্র আলোচনাসভার সুন্দর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তুলে ধরেন।

দ্বিতীয় পর্বের সূচনায় মেদিনীপুরের পটুয়া দুখুশ্যাম চিত্রকর পট দেখিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে গান শুনিয়ে তুলে ধরেন গ্রামের চোখে শহর কলকাতাকে। তাঁর এই নিবেদন অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়েছিল।

ব্যক্তিগত রচনা

মেধার বাতানুকুল ঘুঙুর

মলয় রায়চৌধুরী

মাটিতে বঁটি রাখার ধারাল ধাতব শব্দে মা-এর কথা যে-ভাবে মনে পড়ে, বয়সে কৃতঘ্ন হয়ে-ওঠা স্মৃতি, বালক বেলার নিষ্প্রাণ কাঁজি-ভাত, বাঁশির সস্নেহ ফুৎকারে যে-দূষণবায়ু—পাখালির প্রশ্বাসভরা ডাক : ডোডো-পায়রা ও হাঁসপাখি ও শ্যামতিতির ও বনপ্যাচার অমরত্ব; আহ্, নিজেকে সময়োত্তীর্ণ করার আপ্রাণ দুর্বলতায় মেছুনি তার চাকু দিয়ে কাছিমের তলপেটে গোল নাভি-বোতাম এঁকে উভচরকে স্তন্যপায়ী করে নিতে চায়। নাই, নেইকো, নেই। সারাবছর ধরে আটকে রাখা সবুজ, প্রথম আষাঢ়েই মেলে ধরে নাকাল গুল্ম-ঘাস। জলন্ত হীরের দুর্গন্ধে ভরা নভহাওয়ায় আর কোনোদিন শুনতে পাবোনা যে ডাকধ্বনি; জায়মান কটালের নঞর্থক উচ্ছ্বাস।

সৌন্দর্যবোধ আমাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন করে; প্রস্তরযুগের আয়ুধে লুকিয়ে থাকা ক্রোধ ও ঘৃণার প্রতি ভালবাসা, মাছতের শীর্ণ গোড়ালির কাছে হাতির বিশাল শরীরের সন্তুষ্ট দীনতা।

মা-এর লাশের চোখে-বসা এক ঝাঁক ক্ষুধার্ত মাছিকে হাত নেড়ে উড়িয়ে দিই। আবার এসে বসে যায়। নাকে, মুখে, নখে, কোমরে।

জলন্ত চিতা থেকে গরবা নাচের কাঠি বাজানোর শব্দ। নদীতীরে, গলায় হাড় আটকে থাকা শ্মশান-কুকুরের খুংরি কাশি। ক্ষুরধার আগুন-তরঙ্গের তরল ঝাপট। গোলাপপাপড়ির প্রাংশুল কষ্টসহিষ্ণুতা। যে-ডাক আর শুনতে পাবো না, জীবনে সেরকম শব্দগহ্বর গড়ে ওঠে, যেন শুঁটির শস্যবাতায়ন

থেকে দুহাত মেলে, আলো-পৃথিবীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কীট। জঙ্গল ইজারা নিয়ে, পলাশের উদ্ভিন্ন আগুন নিভিয়ে ফেলবে লাক্ষাকীট অথচ একদিন ওই আগুনের কাছেই লাক্ষার কর্তব্যময় আত্মসমর্পণ, হাঃ!

পিসেমশায় : এসব আবোল-তাবোল ভেবে কী করবি। কেনইবা বার-বার বাড়ি ছেড়ে পালাস!

বার্ড কোং এর আপিসে, দেখি, পিসতুতো বোন গীতার ভুরু আঁকার পেনসিল দিয়ে চিঠি সই করছেন পিসেমশায়। টেনডার খোলা হবে। তার স্বামীর ছ্যাতলা-পড়া দাঁতগুলো উঁচু আর ফাঁক-ফাঁক ছিল বলে, দুটো পাটিই উপড়ে তোলে মুকুজ্জে ডেনটিস্ট। ভাসুরের ছেলের সঙ্গে পরের দিনই গীতা উধাও।

পিসেমশায় : এবছর বিষ্টিতে ভেজার জন্যে তোকে একটা গ্যাবারডিনের স্যুট করিয়ে দেবো।

পিসেমশায় : ছ্যাঃ, পদ্য লিকিস!

পিসেমশায় : ইকি, সোনাগাছি আসিস?

পিংপং হবে যে রে।

সত্যি, শিখরের বরফপাথরের ওপর পা রেখে অবুঝ পর্বতারোহীর স্বাভিমান, যখন প্রথম ও শেষ শিবিরের মাঝে তার নখ গজিয়ে ওঠে সে টের পায়না। কেন্নোর হাঁটার শব্দে লুকিয়ে থাকে ছায়াপথের নক্ষত্রসংঘর্ষ। নিঃসাড় ঝিরিবাদলের কাছে নুয়ে-পড়া নিস্পৃহ প্রাণীজ গাছালিশরীর। কুচকাওয়াজের জুতোর তলায় সোপর্দ ঘাসবালক। আহ, আহারে! কেন তাহলে মানুষের প্রতি আস্থা নেই জীব-জানোয়ারের? পাখালিপাখির? দেখলেই উড়ে যায়! অথচ সমাধিফলকে যে দেখল, যা মৃত্যুকে দীনতা থেকে খালাস করেনা, স্মৃতির হিংসাশ্রয়ী অসতর্কতা আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। ধান ও দুর্বার কাছে আজীবন কৃষকের পায়ের নখ কীভাবে ক্রমশ কুৎসিত হয়ে ওঠে; অভাবের প্রাদুর্ভাব হিংস্র করে জীবনের আন্তরিকতা—এভাবেই সত্যের কাছে গিয়ে পড়লে, আমাদের আগাম অসুস্থতা।

বয়সন্ধির নাবাল অহংকারের গ্লানি থেকে মাঝরাতে যখন বাবার ফোটো কেমিকেলের আলমারির সামনে ভাবছি নিঃশব্দে কেমন করে কাচ ভাঙা যেতে পারে, মাইনাস তেরো চশমার ভেতর থেকে আচমকা পিসেমশায় "হ্যাঁ, ওটাই ফেরিসায়নাইড হুবহু তারমিছরি, তবে অঙ্কায় সময় নেবে, মুখে গাঁজলা,

সারা শরীর দগদগে, ডাঙায় শোলমাগুরের ছটফটানি।" মেধার জ্যোতি-পদার্থে অতিবেগুনিরশ্মির নির্মম আঘাত। হাওয়ায় ঘুরন্ত বুলেটের মতন দ্রবণশীল যৌবন মুহূর্তে এসে পড়ে।

"এররাম, গাঁজা-ভাঙ খাস? পান খা পান খা! সনাতন মিসির-এর মেজ ছেলে বিশ্বম্ভরটাতো শ্রীবাসের ভাইঝিটাকে আধচেবানো পান খাইয়ে··· তোদের লাইবেরিতে বেন্দাবন দাস-এর চৈতন্যভাগবত নেই?"

কোরিয়ার যুদ্ধে প্রতিদিন হাজার টাকা দরে বাবার আপাদমস্তক পরিশ্রমে আমরা আধ-বছরেই ছোটলোক থেকে বড়োলোক। পরদা পিরিচ আসে। পিসেমশায়দের থেকে ভদ্রলোক। বড়দির পৌষ ১৩৫২ আশ্বিন ১৩৫৪ শ্রাবণ ১৩৩৯ এর সাড়ে তিন খণ্ডের গীতবিতান ডিমের ঝোল-মাখা, গানের ঝরনা-তলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে। ঝাঁঝি শেওলা মহিমান্বিত করে স্নানঘর এবং শপথ নেয়া শেষ হলে হাই তোলা কুশান-গুপ্ত-সেন বংশ।

যে-ঘরে মা-এর লাশ রাখাছিল, দেয়ালের পালিশ ক্ষুণ্ণ করেছে রাতভোরের নিভু প্রদীপের চারপাশের ভৌগলিক নিশুতি। মানুষ তার ন্যায্য অধিকার চেয়ে আর্যের কাছে অনার্য পুরুতের কাছে অস্পৃশ্য দাসখতকারির কাছে নৈরাজ্যবাদী হয়ে যায়।

পিসেমশায় বাজার করতে বেরিয়ে সোজা পাটনায় "বুঝলেন সেজবৌদি ভেটকিটা থলেতে নেবো বলে ঝুঁকতেই হাওড়া পোলের মাথাটা দেখতে পেলুম। আপনার হাতের ভেটকি দিয়ে বাঁধাকপি, তা একটু দোরসা হয়ে গেছে বোধায় মাছটা।" সেচপাগল নদী যেমন ঘুমন্ত গ্রামের মুখে তার আধ-খোলা বিনুনির ঝাপট মেরে শ্রাবণ ক্ষোভে জাগিয়ে দেয়, দুধ দোয়ার শব্দের মতন বৃষ্টি; কারিগর মৌমাছির রক্ত দূষিত করে সজনে ফুলের দোআঁশ মধু।

সাতহাজারে কেনা চালাবাড়ি তিনবছরে ধোপদোরস্ত পাকা একতলা আট বছরে দুতলা এগার বচ্ছরে তিনতলা হয়ে উঠলে বাবা-মা-আমি ভাগ করে নিই থাককাটা অট্টালিকার দহনবায়ু। ভাগলপুর ধানবাদ দুমকা চাইবাসা মজফ্ফরপুর লাহেরিয়াসরায় থেকে দাদার আলটপকা পোস্টকার্ডে কাইয়া জুনপুট যাচ্ছি ব্যারাকপুর যাচ্ছি কোচিন যাচ্ছি। বাবার ঈপ্সাহীন রক্তপ্রেম। নোটের গায়ে লেগে থাকা ময়লার গ্লানি নেই। দশবছর পর পুড়তে থাকা কোটি কোটি নোট থেকে মা-এর কুড়ি বছর পরের জলন্ত চিতার গন্ধ।

পর-পর চারটে, ছোড়দি-বড়দি দুজনেরই ফিবছর মেয়ে এবং বাহাত্তর আরপিএম মীরার দুসস্রো ন কোয় চারটুকরো হয়ে কয়লার উনুনে, নিকুচি করেছে কেন যামিনী না যেতে জাগালে না। গান পুড়তে থাকার ওই ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ। আর্তনাদহীন পোড়খাওয়া আঙুরবালা ভীষ্মদেব বিনতা কাননবালা, উত্তপ্ত লুবাতাসে বেঁকে ওঠে আদরবর্জিত অর্গানের হলুদ রিড। উথলানো দুধের তলায় দগ্ধ সঙ্গীত থেকে ছড়িয়ে পড়া বেগুনি-নীলাভ অসামাল ধোঁয়া ছেয়ে থাকে ভাগ্নেদের গোঁফ গজানোর পরও। ফেরত আসেনা গানের গর্হিত আঘাতক্ষমতা। গানের মাঝেকার সেই অস্থির আন্তর্নাক্ষত্রিক বিস্তার, রাণী মৌমাছির চোখের আতসে রঙীন নশ্বরতায় অনমনীয় উচ্ছৃঙ্খলতা, নাকচ এলোপাথার।

রঙীন মাছের অ্যাকোরিয়ামে কাচ জোড়ার ফুটন্ত আলকাতরা-বিটুমিন হাত-ফসকানো গরম কেটলি থেকে ছিটকে পিসতুতো ভাই সেনটুদার বুকের নধর মাংস খুবলে গড়িয়ে পড়ে তলপেটে। শিকড়ে পাথর ছুয়ে শিউরে কুঁকড়ে ওঠা নতুন পেঁপেগাছ রান্নাঘরের পাশের অন্যমনস্ক চিরভেজা মাটিতে। ফিকে হলুদ ডোরা নিয়ে মানিপ্ল্যাণ্টের নৃত্যপটিয়সী বিশাল পাতা জামরুল গাছ বেয়ে আকাশের দিকে দৌড়তে থাকে। কঙ্কালের ব্যক্তিত্বহীনতার প্রতি মানুষের এই অবিমৃষ্যকারী ভয় ও শ্রদ্ধা, টাকা, টাকা, টাকা, টাকা, টাকা, টাকা, তুঁতপাতার সাথে রেশমগুটির স্নায়ুসখ্যতা। টাকা এবং টাকা কিংবা টাকা—নরখাদক নদীর নিশাচর বন্যা বরদাস্তকরার অমানুষিক প্রতিভা।

জলের শীতলবুকের ওপর ঝুঁকে যুবতী-নারিকেলগাছ মৃগেলকিশোরের অবৈধ-প্রণয় দেখে আড়ষ্ট হয়ে থাকে সারাজীবন। ছেলেবেলার বন্ধু মন্ত্রীত্ব পেয়ে ঈশ্বরী পাটনীর ছেলে হয়ে উঠলে, তার সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরে ফেনি-বেওড়ার বোতল উঁচুতে তুলে পিসেমশায় "যারা স্বপক্ষে বলো নোওপ যারা বিপক্ষে বলো য়া।" আমরা সবাই য়া য়া য়া নোওপ নোওপ নোওপ য়া য়া। সকালে, নিভাঁজ স্যুট পরে, ইণ্টারভিউ নিতে হবে বলে, পিসেমশায়ের প্রশ্ন-উত্তর মুখস্তর চেঁচামেচি।

ছুটির দিনে নির্বিশেষ মিছিলের সঙ্গে অবান্তর শহর পরিক্রমায় পিসেমশায়ের ভেরিকোজ ভেন, গলায় চিৎকার আটকে হাঁপানি, ৫৫৫ এর ডিবেতে সিগারেট ঠোকার সবজান্তা শব্দ। পকেটে গন্ধ-রুমালে মোড়া ছঘরা পিসতল, চিরকুটে "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।" নির্মল মাঝরাতে ঘুম ভেঙে

আলসেহীন ছাদের বিছানায় হাওড়া পোলের লাল আলোর অনর্গল ছেয়ে ফেলে স্বতঃস্ফূর্ত বোধহীনতা, অনড় অন্ধকার। উঠে বসেন। পলিজ ভূধর। পৃথিবীর দিকে শেষবার তাকিয়ে দেখার অনভিপ্রেত ও নির্লিপ্ত স্পর্ধায় ফাঁকা আত্মধিক্কার। কেননা, মানুষের সমগ্র চেতনাশরীরকে ভালবেসে ফেলার উদ্দাম বিলাসিতা থাকে বিষের অদম্য মমতায়। উঠে দাঁড়িয়েই ছুটে যান। দূরে, হাওড়া স্টেশন থেকে বিজলী ট্রেনের ইঙ্গিত-শিঙার আবছা ফোঁপানি।

রাত্রির উদাস স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে মাটির সাথে হাড়মাংসের সংঘর্ষ-শব্দ, যেন বিচালি আছড়ে ধান আলাদা করে কৃষক রমণী যেন জোনাকিকীটের শাঁস-খাওয়া ডাহুকের দ্যুতিময় তলপেট দেখে তার পরপুরুষ হেসে উঠেই থেমে যায়, যেন গ্রাসাচ্ছাদনের নিম হৃদিসহীন নরখাদক মানব আচমকা কাণ্ড-জ্ঞানহীনতা থেকে গুহাচিত্র এঁকে ফেলে স্বগোত্রের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে ওঠে, যেন দৃপ্তকণ্ঠ বোবার দরদগম্ভীর শ্রবণহারামি যা ধ্বনিলহরীর তড়িৎকণিকায় আটকে যায়, ভাতের নিরেট কাঁকরদানায় মানবসভ্যতার শৌর্যবেদনা যেন দুই দাঁতের মাঝে আচম্বিতে।

কোরা মার্কিন কাপড়ের পুঁটুলিতে রাজপথ থেকে চেঁছে তোলা মানব-লাবণ্য—অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ করতে গিয়ে সমগ্র অস্তিত্ব নোংরা হয়ে যায়।

গল্প

উত্তরাধিকার

আদিনাথ ভট্টাচার্য

সুপ্রাচীন মহান ঐতিহ্যমণ্ডিত 'পদ' বংশধারার বর্তমান প্রজন্মের প্রতিভূ হরিপদ অত্যন্ত চিন্তাকুল এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তার এই বিমূঢ়তা যথেষ্ট সঙ্গত কিনা বিচার করতে হলে পরিপ্রেক্ষিতটি পরিষ্কার তুলে ধরা দরকার।

হরিপদ তার মাতার অষ্টম গর্ভজাত সন্তান। শুধুমাত্র এই তথ্যের ভিত্তিতে তার পিতাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন অবিবেচক পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত করা অন্যায় হবে। কেন না, অষ্টম গর্ভে হরিপদর আবির্ভাব পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া তার পিতা মাতার কোনো বিকল্প ছিল না। কারণ তাঁদের তনুজ প্রথম সাতটি সন্তানই কন্যা। ফলে, বংশরক্ষার প্রবল তাগিদে এবং ঘোরান্ধকার বিভীষি-কাময় পুন্নাম নরকে চিরবন্দিত্বের সম্ভাবনাকে নিরসন কল্পে তার পিতাকে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়েই যেতে হচ্ছিল। অবশেষে অষ্টম প্রচেষ্টায় যখন হরি-পদর আবির্ভাব ঘটল তারপর থেকে তিনি পরম নির্বেদে নির্ভেজাল সাত্ত্বিক জীবন যাপন করেন। বস্তুত হরিপদ তাঁর একমাত্র পুত্র এবং শেষ সন্তান। ইত্যাদি কারণে তাঁকে কোনোমতেই দায়িত্বজ্ঞানহীন অবিবেচক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না।

কিন্তু তিনি পেশায় ছিলেন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের নগণ্য কেরানী এবং তাঁর সংসার ছিল সম্পূর্ণ বেতন নির্ভর। কারণ, যে দপ্তরে তিনি কাজ করতেন সেখানে অতিরিক্ত উপার্জনের সুযোগ ছিল না এবং সুযোগ-সম্পন্ন কোনো দপ্তরে বদলি হওয়ার জন্য যে এলেম, কৌশল বা উদ্যম প্রয়োজন, সেটাও তাঁর

ছিল না। ফলে তাঁর পিতৃকর্তব্যে কিছু কিছু স্খলন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। যেমন তিনি কোনো কন্যাকে পাত্রস্থ করতে পারেন নি এবং হরিপদর ভবিষ্যৎকে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। অবশ্য জ্যেষ্ঠ দুই কন্যা বংশের মুখে চুনকালি মাখিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল। দুইবারই পিতা গুম হয়ে থেকে ছিলেন এবং গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। অপরপক্ষে পুত্র হরিপদ ঠোক্কর খেতে খেতে স্কুল ফাইন্যালের দোর গোড়ায় বেশ কিছুকাল থমকে দাঁড়িয়ে থাকার পর পিতৃপুরুষদের আশীর্বাদে যখন কোনো রকমে টপকে গেল, তখন তার পিতা আলসার এবং আরও নানাবিধ রোগে জর্জর নশ্বর দেহটিকে পঞ্চভূতে বিলীন করে তাঁর মহান বংশধারার পূর্বসূরীদের মধ্যে চিরস্থায়ী হয়ে গেলেন। পাঁচ বোন এবং মায়ের ভরাট সংসার হরিপদ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করল।

হরিপদর পিতা অকালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং এই কাজটি করার জন্য হরিপদ তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ। কেননা, তাঁর অবসর গ্রহণ করার আরও দু বছর বাকি ছিল অর্থাৎ তিনি কর্মরত অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন। এই একটি কারণে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী পিতার প্রতিষ্ঠানে হরিপদ সর্বকনিষ্ঠ কেরাণির পদটি লাভ করে। অবসর গ্রহণের পর সময়মত স্বর্গগত হলে কী যে দশা হোত ভেবে হরিপদ শিউরে ওঠে এবং গোপনে পিতাকে অশ্রুসিক্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে।

সেই থেকে মধ্য-ভিকটোরীয় যুগের একটি স্যাঁতসেতে জীর্ণ অট্টালিকার অন্ধকারময় ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ হরিপদর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি। আলোকিত উপরতলার মানুষদের সংগে তার যোগাযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। ভূগর্ভস্থ সেই কক্ষে অফিসের সব মৃত নথিপত্র স্তূপীকৃত করে রাখা হয়।

কখনও কখনও সেই সব মৃত নথিপত্রের মধ্যে কোনো কোনোটার উপর-তলায় তলব পড়ে। হরিপদর কাজ হচ্ছে স্তূপ ঘেঁটে সেই নথি খুঁজে বের করে ঠিক মতো পাঠিয়ে দেওয়া। আর উপর থেকে নতুন কোনে নথি এলে ঠিক ঠিক জায়গায় সাজিয়ে রাখা। পরম দক্ষতায় দিনের পর দিন সে এই কাজ করে যাচ্ছে।

তার কাজকর্ম তদারক করার জন্য ওই দপ্তরে প্রৌঢ় আর একজন কেরাণি আছেন। হরিপদ রেকর্ডসাপ্লায়ার আর তিনি রেকর্ডকীপার। বংশ-গৌরব এবং মর্যাদায় তিনি হরিপদর সমপর্যায়ভুক্ত। হরিপদ যখন প্রথম এই দপ্তরে

কাজে যোগদান করে তখন তিনি পরম সমাদরে তাকে গ্রহণ করেছিলেন, তার পিতৃকুল মাতৃকুলের বিশদ বিবরণ নিয়েছিলেন। তারপর যখন তার সাংসারিক এবং পারিবারিক অবস্থা সম্পর্কে ধীরে ধীরে অবহিত হলেন, তখন থেকে একটু গভীর এবং শীতল হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু পরবর্তী পাঁচ বছরে হরিপদর সাংসারিক পরিবেশে অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। তার মা দেহরক্ষা করেছেন। পোষ্য পাঁচ দিদির মধ্যে চার-জনই 'আপন জন' হিসাবে কোথাও না কোথাও স্বজনদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে গিয়েছিল। ফলে মাতৃহারা হরিপদর প্রতি প্রৌঢ় রেকর্ডকীপারের সজল স্নেহ সমধিক ধারায় বর্ষিত হতে থাকল। তিনি একদিন হরিপদকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন, সেখানে তাঁর প্রৌঢ় স্ত্রী হরিপদর মায়ের শূন্যস্থান পূরণের বারং-বার আশ্বাস দিলেন এবং তাঁর লজ্জাবনতা কন্যা নিজের হাতে তৈরি চা জল-খাবার ইত্যাদি পরিবেশন করে গেল। এর কিছুদিন পরেই প্রৌঢ় রেকর্ড-কীপার রেকর্ড সাপ্লায়ার হরিপদর শ্বশুর হয়ে গেলেন।

তারপর আরও বছর চারেক কেটে গেছে। একদিন রাত্রে হরিপদর বুকে মুখগুজে হরিপদর বউ আদুরে গলায় বলল—'এই জানো আজ দুপুরে না মল্লিকা এসেছিল।

—'মল্লিকা কে?'

—ওমা তাই তো, তুমি কি করে জানবে। তোমাকে তো বলাই হয়নি। আমাদের উল্টো দিকে গলিটার একেবারে কোণের যে বাড়ি, তার একতলার একটা ঘর নিয়ে ওরা থাকে। নতুন এসেছে। আজ আমার সংগে আলাপ করতে এসেছিল বলল—'পাড়ায় নতুন এসেছি। মেলামেশার মতো ভদ্র পরিবার তো আশে পাশে নজরে পড়ে না। দূর থেকে আপনাকে দেখেছি, কর্তা যখন সকালে আপিস যান আপনি দরজায় এসে দাঁড়ান। মনে হলো আপনাদের সংগে মেলামেশা করা যায়, তাই চলে এলুম।' মেয়েটা খুব সরল আর ভালো। অনেকক্ষণ গল্পসল্প করল। সংগে ওর ছেলেকে নিয়ে এসেছিল—কী ফুটফুটে সুন্দর ছেলে, বছরখানেক বয়স। অথচ জানো ওদের বিয়ে হয়েছে মাত্র দুবছর। যাওয়ার সময় বলে গেল—'যা-ই বলুন দিদি, ঘরে একটা বাচ্চা না থাকলে ঠিক মানায় না।'

হরিপদর বউ আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে হরিপদকে জড়িয়ে ধরল।

হরিপদ শক্ত হয়ে থাকে। সে জানে আবেগের দ্বারা তাড়িত হলে তার

চলবে না। সে তার বাবাকে দেখেছে এবং নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন। পাঁচশো টাকা রোজগার, ঘাড়ের উপর এক দিদি, সরকাণাগলির ভিতরে এই বস্তিবাড়ির আট বাই দশ এক কামরার বাসা, সামনের ছোট্ট একফালি বারান্দায় রান্না খাওয়া আর দিদির শোওয়া। সে ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

এমনি করেই চলছিল। ইতিমধ্যে মল্লিকার স্বামীর সংগে পরিচয় এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতাও গড়ে উঠেছে। একদিন মল্লিকার স্বামী বলল—'আপনাদের ব্যাপারটা কী বলুন তো মশাই। চারবছর হয়ে গেল, অথচ···।'

হরিপদ ভদ্রলোককে কথা শেষ করতে দেয় না। একটু গম্ভীর হয়ে বলে—'ও কথা থাক।'

ভদ্রলোক তবু নাছোড়বান্দা—থাকবে কি মশাই। আপনার স্ত্রীর দিকটাও তো দেখতে হবে। আমার স্ত্রীর মুখে শুনেছি, ওনারও খুব ছেলের সখ। শুধু আপনার জন্যই নাকি··। তা প্রবলেম ট্রবলেম কিছু থাকলে বলুন না, আমার জানাশোনা ডাক্তার আছে।'

হরিপদ বিরক্ত বোধ করে, ভাবে কড়া একটা কিছু জবাব দিয়ে এই আলোচনার চিরতরে যবনিকাপাত ঘটাবে। কিন্তু তার মতো লোকেদের ক্ষেত্রে যা হয়, সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর মুখমণ্ডলের পেশীগুলোকে একটু নরম এবং যথোচিত কুঞ্চিত করে একটা হাসির ভাব ঠোঁটের কোণে এনে বলে—'না, ওসব কিছু নয়। আমরা ইচ্ছে করেই ঝামেলায় যাইনি, স্রেফ ফ্যামিলি প্ল্যানিং। যা দিনকাল।'

সে এ বিষয়ে আর আলোচনা গড়াতে দেয় না। কিন্তু তার মনের মধ্যে একটা কাঁটা অজান্তে বিঁধে যায়। কাঁটাটার আসল প্রকৃতি কি অথবা ঠিক কোথায় এটা বিঁধেছে সে স্পষ্ট বোঝে না। দিনমানের ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ এবং রাতের কাণাগলির খোপরির মাঝখানকার নিস্তরঙ্গ নিথর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ কিছু বুদবুদ ভেসে ওঠে। তখন সে এক ধরণের অস্বস্তি বোধ করে, কিন্তু কীসের অস্বস্তি কেন অস্বস্তি ঠিক বুঝতে পারে না।

এই অস্পষ্ট অনুভূতির কারণ একদিন তারকাছে পরিস্কার হয়ে যায়। ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ থেকে কয়েকটি মৃত নথির উপরতলায় তলব পড়েছিল, কিন্তু নথিগুলো হাতের কাছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। দায়িত্ব হরিপদর, সুতরাং সমস্ত স্তূপ ঘেঁটে নথি খুঁজে বার করে সে যখন মাটির তলা থেকে বাইরে বেরিয়ে

এল, তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। বাসে চেপে সে নির্দিষ্ট স্টপে এসে নামল। এখান থেকে মাইলখানেক রাস্তা গলি-ঘুঁজির মধ্য দিয়ে হেঁটে তাকে বাড়ি পৌছোতে হবে। সে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে যখন সে রাস্তার বাঁকে ডালপালা ছড়িয়ে আকাশ ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকা বটগাছটার নিচে এসেছে, তখন ঝপ করে সব আলো নিভে গেল। লোডশেডিং। হরিপদ থমকে দাঁড়ায়। হঠাৎ বটগাছের আনাচ কানাচ থেকে একসংগে যেন অজস্র দীর্ঘশ্বাসের ঝড় বয়ে তাকে তাকে কাঁপিয়ে দিল, হরিপদ উপরের দিকে তাকায়। দেখতে পায় গাছের ডালপালা থেকে অন্ধকারের শরীর নিয়ে ছোটো বড়ো নানা আকৃতির অবয়ব ঝুলে আছে। তারা দুলছে, দুলতে দুলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে আর হাত নেড়ে, হরিপদকে কেবলই ডাকছে। হরিপদর মনে হল অন্ধকার-অবয়বগুলো ক্রমশ স্পষ্ট হতে হতে ঊর্দ্ধপাদ অধঃশির কিছু মানুষের রূপ পরিগ্রহ করছে। এইসব মানবমূর্তির মধ্যে একজন তার পরিচিত—যিনি ধরাধামে তার পূজ্যপাদ পিতৃদেব ছিলেন। দিশাহারা হয়ে পা বাড়াতে গিয়ে হরিপদ হোঁচট খেয়ে পড়ে এবং অবচেতনায় তলিয়ে যায়। সেই অবচেতনার মধ্য থেকে তার কানে ফিস ফিস কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে থাকে—"বৎস হরিপদ, আমরা তোমার হতভাগ্য পিতৃপুরুষ। এতদিন ধরে তিল তিল যত্ন এবং পরিশ্রমে যে মহান ঐতিহ্যমণ্ডিত বংশধারা গড়ে তুলেছি তার সমূহ বিলোপ আশংকায় অত্যন্ত কাতর। ঘোর বিভীষিকাময় নরকের চির অন্ধকারে আমরা সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হতে চলেছি, একমাত্র তুমি আমাদের সেই বিভীষিকা থেকে পরিত্রাণ করতে পারো। নিজের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সুখ স্বাচ্ছন্দের দিকে না তাকিয়ে বৃহত্তর স্বার্থে একটি পুত্রসন্তান পালন কর, তা হলেই আমরা মুক্তি পাবো। বৎস মনে রেখো তুমি পুরুষ। পৌরুষ তোমার মজ্জাগত। সেই পৌরুষের অবমাননা করা মহাপাপ। এই সব বিবেচনা করে যথা কর্তব্য পালন কর।"

হরিপদ অনেকক্ষণ সেই বটগাছের নিচে নিশ্চল পড়ে থাকে। তারপর একসময় আলো জ্বলে ওঠে। ধীরে ধীরে সে চেতনায় ফিরে আসে, উঠে দাঁড়ায়, বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। চলতে চলতে তার মস্তিষ্কে দুটি শব্দ নড়াচড়া করে—'বংশরক্ষা' এবং 'পৌরুষ'। বিশেষ করে পৌরুষ। পিতৃপুরুষের সতর্কবাণী তাকে সচেতন করে দেয় যে জন্মসূত্রে সে পুরুষ অথচ তার পৌরুষ প্রমাণসাপেক্ষ। সে হঠাৎ কেমন করে যেন বুঝতে পেরে যায় অপরীক্ষিত এবং অপ্রমানিত পৌরুষই তার অস্বস্তির মূল কারণ।

এবং অস্বস্তির এই মূল কারণটা বোধগম্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহান ঐতিহ্য-মণ্ডিত 'পদ' বংশধারার বর্তমান প্রজন্মের প্রতিভূ হরিপদ অত্যন্ত চিন্তাকুল এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

সে অনেক চিন্তা করে, বিবেচনা করে। অবশেষে একটি স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছোয়। 'পদ' বংশ তথা পিতৃপুরুষ এবং উত্তরপুরুষের প্রতি তার একটা জন্মগত দায়িত্ব আছে। উপরন্তু পৌরুষের ব্যাপারে আজীবন সংশয় নিয়ে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। তাকে জানতে হবে, প্রমাণ করতে হবে, সে ক্লীব নয় পুরুষ।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হরিপদ তৎপর হয়। অবশেষে একদিন তার বউ সলজ্জ হাসি মুখে বলে—"এই জানো, আমার যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে"।

—"তার মানে?"

—"জানি না। মানে বুঝতে পারছে না যেন।"

হরিপদ বিস্ফারিত চোখে খানিকখন বৌ-এর দিকে তাকিয়ে থাকল। সে মানে বুঝতে পেরেছে। তার নুয়ে পড়া দেহের খাঁচার মধ্যে বাতাস বইতে থাকে, শিরায় ধমনীতে ছলাৎ ছলাৎ নদী, বুকের মধ্যে বিদ্যুতের গুরু গুরু। সে টান টান হয়ে যেন নিজেকে ছাড়িয়ে যায়, ছুটে গিয়ে সমস্ত শক্তিতে বৌকে জড়িয়ে ধরে। তার বাহুবেষ্টনির মধ্যে বৌ হাঁসফাঁশ করে—

—"কি হোলো তোমার, পাগল হয়ে গেলে নাকি?"

হরিপদ বৌকে ছেড়ে দেয়—"আ, তুমি আমাকে একেবারে নিশ্চিত করে দিলে। আমি পারি। আমি পুরুষ। পূর্বপুরুষের আশীর্বাদ নিয়ে আমি চিরকাল থেকে যাবো।"

মৃদুকণ্ঠে বৌ বলে—"শুধু তুমি কেন, আমিও মা হতে পারি বলো। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে—"কিন্তু যদি না হয়? আমি শুনেছি অনেক সময় এমনি এমনি অজ্ঞকারণেও এরকম হয়। তারপর ধর ছেলে না হয় মেয়ে হলো? তখন? তোমার বাবারতো সাতসাতটা মেয়ে তারপর তুমি।"

হরিপদ বউয়ের মুখে হাত চাপা দেয়—"থাক, ওসব অলুক্ষণে কথা আর বলতে হবে না। পৌরুষ আমাদের বংশগত, আমার রক্তের মধ্যে। 'পদ' বংশে তুমি এমন একজনও পাবে না, যে পুরুষ ছিল না। আমার কোনো সন্দেহ নেই, তুমি মা হতে চলেছ। যদি মেয়ে হয়? হবে। আমার পূর্ব-

পুরুষের দুর্ভাগ্য। কিন্তু আমি যে পুরুষ, সেটা তো প্রমাণ হল। তারপর তো ইচ্ছাই সব।

প্রমাণিত পৌরুষের ফসলের জন্য হরিপদ অপেক্ষা করে থাকে। তার জীবনে এখন আর কোনো দুর্বোধ্য অস্বস্তি নেই। সংশয়াতীত জ্ঞান আর পরম প্রাপ্তি তার আয়ত্বাধীন। ভূগর্ভস্থ অন্ধকার প্রকোষ্ঠের দিনমান আর কাণাগলির দমবন্ধ খোপরির রাত্রিযাম তার কাছে এখন একাকার।

অন্ধকার শীতলতার মৃত নথিপত্রের স্তূপ সাজিয়ে রাখতে রাখতে তার দিনের পর কেটে যায়। নতুন নতুন ফাইল মৃত হয়ে আসে, ঠিক ঠিক মতো জায়গায় তাদের আসন পাকা হয়ে যায়। কখনও কখনও মৃত ফাইলদের মধ্যে কোনো কোনোটার উপরতলায় তলব পড়ে। এইসব ফাইলদের মরে যাওয়া, মরে থাকা, শবদেহের ওঠানামা তার জীবনের দিনরাত্রি ভরাট করে রাখে। সে তদগতচিত্তে পুরো ব্যাপারটা অনুধাবন করতে চেষ্টা করে। সে বুঝতে পারে তার অজানা উপরতলায় অদেখা সর্বশক্তিমান বড়োসাহেবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত লাল কালির সই হলেই একটা ফাইল মরে যায়। সেই ফাইল মাটির নিচে কবরের জন্য তার কাছে চলে আসে। বড়োসাহেবের লাল কালিতে সই হওয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অনুলিপি থেকে মাটির উপরে আর একটি নতুন ফাইলের জন্ম হয়। সেই নতুন ফাইলের ধারাবাহিকতা এবং পদ্ধতিগত গতিপ্রকৃতির অপরিবর্তনীয়তা রক্ষা করার জন্য মৃত নথির তলব পড়ে। আবার কিছুদিন পরে সেই মৃত নথি তার জায়গায় ফিরে আসে। হাজার হাজার আলাদা আলাদা ফাইল। প্রত্যেক ফাইলে শুধু একটা করে লাল কালির সই হওয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কোনো সিদ্ধান্ত বড়ো, কোনোটা ছোট, কোনোটা গুরুত্বপূর্ণ, কোনোটা মামুলি। কিন্তু সিদ্ধান্ত একটা আছেই আর সিদ্ধান্ত হলেই ফাইল মরে যায়। এই সমস্ত ব্যাপারটা তাকে সব সময় ঘিরে রাখে, অস্বস্তিহীন অচঞ্চল অস্তিত্বকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে।

হরিপদ একদিন সকালে ভূগর্ভস্থ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। প্রাণ-প্রিয় মৃত ফাইলেরা তাকে দেখে মুখর হয়ে ওঠে। হরিপদ স্তূপীকৃত সেই মৃত নথিপত্রের সংগে কেমন যেন একাত্মবোধ করে। সে পরম মমতায় ফাইলগুলোর গায়ে হাত বোলায়, তাদের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করে। এবং একসময় সে বুঝতে পারে ফাইলেরা সমস্বরে গুঞ্জন করে বলছে—'হরিপদ তুমি আমাদেরই একজন।

তোমার সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে, লাল কালিতে লেখা হয়েছে তুমি পুরুষ।'

নিরালোক পাতাল প্রকোষ্ঠে হরিপদ এদিক ওদিক তাকায়। চারদিকে চওড়া চওড়া সুন্দর তাক। পরপর নথিপত্র সাজানো। এখনও অনেকটা জায়গা ফাঁকা আছে। একটা ফাঁকা জায়গা দেখে সে তাকের উপর উঠে বসে থাকে। হরিপদ সম্পর্কিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অনুলিপি থেকে যে নতুন ফাইল জন্ম নেবে, তার প্রয়োজনে যদি কখনও উপর তলায় তলব পড়ে, তখন সে নড়বে।

সম্পাদকীয়

এদেশের নিরাপত্তার ভিত্তি যে কতদূর পলকা সম্প্রতি তা প্রত্যেক ভারতবাসীর গোচরে এসেছে। এতদিন তথাকথিত কেন্দ্রীয় নেতারা অনিয়ন্ত্রণযোগ্য জনস্যার মুখোমুখী হলেই বহিঃশত্রুর আক্রমণের সদা-প্রস্তুত শঙ্কার প্রতি আমাদের মুখ ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে আসছিলেন। দেখা গেল আমাদের নিজস্ব ঘরের আয়নায় পিছনকার পারদেই রয়েছে গলদ। আশা করি অপরাধীদের এমন যোগ্য শাস্তি হবে যাতে ভবিষ্যতে এধরণের দেশ বেচাকেনার সম্ভাব্য পাপীরা শিউরে উঠতে পারে।

ইন্দিরা গান্ধী নিজে প্রাণ দিয়ে কংগ্রেসের আয়ু বাড়িয়েছেন। তাতে দেশ বাঁচলো কিনা, কিংবা নেতাদের কাণ্ডজ্ঞান দুর্নীতির শাখাপ্রশাখা ছেড়ে ন্যূনতম সততায় ফিরে এলো কিনা, তা এখন ক্রমশই লক্ষণীয় হবে। নিপাতনে সিদ্ধ ধরে নিয়ে যে দল অন্যায়ভাবে কাশ্মীর ও অন্ধ্রের সরকারের পতন ঘটিয়েছিল, তাদেরই হাতে দলবদল বন্ধের যে বিলটি পাশ হলো তাতে আমরা জন্যিই আনন্দিত। স্বীকার করে নেওয়া ভাল রাজীব বোধহয় একটু আলাদা হাওয়া আনতে চাইছেন সরকারী প্রশাসনে! এটা ভঙ্গী না হয়ে যদি সত্যিই দেশশাসনের সঙ্গী হয়ে উঠতে পারে তা হলে খুশী হবো।

আসলে স্বাধীনতার আগে আমরা দেশকে যতখানি ভালবাসতাম এখন তার শতাংশও বাসি কিনা সন্দেহ। ফলে পাইয়ে দেবার রাজনীতি এমন একটা স্তরে পৌছে গিয়েছে যে এর থেকে সমূহ প্রত্যাবর্তনের পথে ফিরে না এলে কোন দলই টিকবে না। যেহেতু দলের জন্য দেশ নয়, দেশের জন্যই তথাকথিত দলের গঠন, সেই মূল লক্ষ্যের হেতুতেই দলীয় আত্মকেন্দ্রিক রাজনীতি থেকে বোধহয় কিছুটা সরে আসা উচিত দেশের সামগ্রিক সমস্যা ও তার প্রতিকারের গুরুত্বের দিকে প্রধান লক্ষ্য রেখে। দেশ না বাঁচলে দলও,

বলা বাহুল্য বাঁচবে না। সাময়িক উত্তেজনা ছাড়া নির্বাচনের জয়-পরাজয় জন-সাধারণের কোন কাজে এখনো লাগছে না। দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। এদেশের মানুষ এখনো দৈবের ওপর যতটা স্থিতধী, সংস্কারবহুল ধর্মের বর্মে যতটা আত্মরক্ষাপরায়ণ, সমবেত প্রতিবাদের সমভূমিতে দাঁড়াতে ততটাই অনিচ্ছুক। ভ্রান্ত নেতৃত্বের ধারায় আমাদের মেরুদণ্ডই গেছে অনেকটা বেঁকে। বাইরের শত্রু আমদানীর চেষ্টা যতই সোচ্চার হোক না কেন, আসলে ভারতবাসীই ভারতবাসীর প্রধান শত্রু। রাজনীতির চেয়ে লাভজনক ব্যবসা আর নেই এটা বুঝে যাওয়ার পরই আভ্যন্তরীণ নোংরামী ক্রমবর্ধমান। তাই বলছিলাম স্বাধীনতার আগে দেশকে যত ভালবাসতাম আমরা, তার স্বর্ণময় নিখাদ অংশটুকু উবে গেছে, শুধু ভণ্ডামির তলানিটুকু পরে আছে। দেখা যাক ৪০ বছরের এই যুবক কি করেন।

বিভাবের আট বছর পূর্ণ হলো। এই দীর্ঘ সময়ে আমরা আমাদের সাধ্যমত রচনা পরিবেশনার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি তরুণ প্রবীণ সকলের লেখাই পাশাপাশি রাখতে। প্রকাশিত বেশ কিছু রচনা পাঠকের স্মৃতিধার্য হয়েছে, নানা প্রসঙ্গে এবং বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থে তার পুনরুল্লেখে তা টের পাই। আমাদের আন্তরিক চেষ্টা থাকবে বিভাবকে আরো উন্নত রচনায় সমৃদ্ধ করে তুলতে। এই কাগজের প্রচার যেমন বাড়ছে, তার মান উন্নয়ণের দায়িত্বও বেড়েছে। অতীতেও আমরা অনেক প্রকৃত গুণী জ্ঞানীর রচনা পেয়েছি, পেয়েছি তাদের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা। ভবিষ্যতেও বিভাব তাদের প্রণিধান-যোগ্য রচনা থেকে বঞ্চিত হবেনা এই আশা আমাদের রয়েছে। ভাল লেখা ভাল লেখকরাও সবসময় লিখে উঠতে পারেন না। অনেকটা এই কারণেও কাগজ প্রকাশে আমাদের মাঝে মাঝেই দেরী হয়ে যায়। তবু প্রতিটি লেখাই উত্তীর্ণ হলো মানে, এমন দাবী আমাদের নেই।

এবছর সাহিত্যের আকাদেমী পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীদময়েশ মজুমদার। এতাবৎ পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে তিনিই বোধহয় সবচেয়ে বয়োকনিষ্ঠ। তাকে বিভাবের তরফ থেকে অভিনন্দন। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীদিব্যেন্দু পালিত, তাকেও আমাদের শুভেচ্ছা। এরা দুজনেই ভবিষ্যতে আরো উল্লেখ-যোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি করবেন, এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

বিভাব সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

Let the buds of your hopes Aspirations
Blossom under the surest protection of peerless

With Best Compliments of

★

The Peerless General Finance

&

Investment Company Limited

ESTD : 1932

Regd. & Head Office :

PEERLESS BHAVAN, 3 ESPLANADE EAST
CALCUTTA-700 069

TOTAL ASSETS OVER Rs. 500 CRORES
INDIA'S LARGEST NON-BANKING
SAVINGS COMPANY

BIVAV

Price : Rs. 5·00
Vol. 8 No. 1

February '85

Regd. No.
R. N. 30017/76

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী দিচ্ছেন

প্রতি সাপ্তাহিক খেলায়

প্রথম পুরস্কার	১	১,৫০,০০০ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার	৫	১০,০০০ টাকা (প্রতিটি)
তৃতীয় পুরস্কার	১৫০	১,০০০ টাকা (প্রতিটি)
চতুর্থ পুরস্কার	১৫০০	৫০ টাকা (প্রতিটি)
পঞ্চম পুরস্কার	১৫০০	২০ টাকা (প্রতিটি)
ষষ্ঠ পুরস্কার	১৫০০০	১০ টাকা (প্রতিটি)

পুরস্কারের
সংখ্যা
৩৬ হাজারেরও
বেশী

৫-১২-১৯৮৪ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ৪৯৬ তম খেলা হইতে প্রযোজ্য

টিকিট, এজেন্ট এবং বিক্রেতাদের জন্য আকর্ষণীয় কমিশন। এজেন্টদের ১ম হইতে ৫ম পুরস্কারের জন্য বোনাস এবং বিক্রেতাদের ১ম হইতে ৬ষ্ঠ পুরস্কারের জন্য বোনাস।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য টিকিটের অপর পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রতি টিকিট ১ টাকা

খেলা প্রতি বুধবার

ডাইরেক্টর অফ স্টেট লটারিজ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৬২, গণেশচন্দ্র এভিনিউ
কলিকাতা-৭০০ ০১৩
ফোন : ২৬-৫৬০৮, ২৬-৫৬৬৬

A/WBSL-6